সকালবেলা হোটেলের ঘরে টেলিফোন বেজে উঠল ঝনঝন শব্দে। বাথরুমেও টেলিফোন আছে, দুটো ফোন একসঙ্গে বাজলে বেশি শব্দ হয়। কাকাবাবু বাথরুমের আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দাড়ি কামাতে-কামাতে গুন্‌গুন্‌ করে একটা গান গাইছিলেন, বেশ চমকে উঠলেন টেলিফোনের আওয়াজ শুনে।

এই হোটেলের অনেক কর্মচারীই বাঙালি। প্রথম দিন রিসেপশান কাউন্টারে এসে কাকাবাবু নিজের নাম বলার আগেই একটি মেয়ে তাঁকে চিনতে পেরেছিল। হাসিমুখে হাতজোড় করে বাংলায় বলেছিল, "নমস্কার সার, আপনি নিশ্চয়ই মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী ? আসুন, আসুন, আমাদের হোটেলের কী সৌভাগ্য !"

সেই মেয়েটির নাম মণিকা দাশগুপ্ত। সে সঙ্গে-সঙ্গে একটা অটোগ্রাফ খাতা বার করে কাকাবাবুর সই নিয়েছিল।

এখন কাকাবাবু ফোনের রিসিভার তুলে 'হ্যালো' বলতেই সেই মণিকা নামের মেয়েটিই বলল, "গুড মর্নিং সার। দু'জন ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। ওপরে আপনার ঘরে পাঠিয়ে দেব ?"

কাকাবাবু ঘড়িতে দেখলেন, সাতটা পঁচিশ বাজে। এরকম সকালে কারা দেখা করতে এল ? কারও তো আসবার কথা নেই। তিনি যে ভাইজাগ এসেছেন, তাও বিশেষ কেউ জানে না। কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে রইলেন। সকালবেলা যে-কোনও লোকের সঙ্গে তাঁর কথা বলতে ইচ্ছে করে না। ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে তিনি অনেকক্ষণ সমুদ্রের ধারে পায়চারি করেছেন, এখন দাড়ি কামিয়ে স্নানটান করবেন, তারপর ব্রেকফাস্ট খাবেন। দশটার সময় তাঁর এক জায়গায় যাওয়ার কথা আছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কারা এসেছেন, মণিকা ? ওঁদের কি আমার সঙ্গে দেখা করার কথা ছিল ?"

মণিকা বলল, "না সার। সেটা আমি আগেই জিজ্ঞেস করেছি। এঁদের

কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেই। কিন্তু এঁরা বলছেন, আপনার সঙ্গে জরুরি দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "দুঃখিত। ওঁদের বলে দাও, এখন দেখা করতে পারছি না। আমি এখনও তৈরি হইনি।"

কাকাবাবু ফোনটা রেখে দিয়ে গালে আবার সাবান ঘষতে লাগলেন।

আবার বেজে উঠল ফোন।

কাকাবাবু এবার একটু কড়া গলায় বললেন, "মণিকা, আমি চাই না কেউ এখন আমাকে বিরক্ত করুক। আমি এখন স্নান করতে যাচ্ছি। সকাল ন'টার আগে আমাকে আর টেলিফোনে ডেকো না।"

মণিকা আড়ষ্টভাবে বলল, "দুঃখিত সার, আমি আপনাকে বিরক্ত করতে চাইনি সার, কিন্তু এঁরা বলছেন, এঁরা পুলিশ ডিপার্টমেন্ট থেকে এসেছেন, আপনার সঙ্গে জরুরি কথা আছে। আপনি ফোনে কথা বলবেন?"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশের সঙ্গেও আমার কোনও জরুরি কথা থাকতে পারে না। আমি এখানে বেড়াতে এসেছি, কোনও কাজের কথা শুনতে চাই না!"

ফোনটা কেটে দিয়ে কাকাবাবু আবার দাড়ি কামানোতে মন দিলেন। কিন্তু একটু আগে যে গানটা গাইছিলেন, সেটা আর মনে এল না।

দাড়ি কামিয়ে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে তিনি সুটকেস খুলে জামা-কাপড় বার করতে লাগলেন।

হোটেলের ঘরের এক দিকের দেওয়াল সম্পূর্ণ কাচের। পরদা সরালেই দেখা যায় সমুদ্র। এই শহরটার নাম কেউ বলে বিশাখাপত্তনম, কেউ বলে ভাইজাগ। এখানকার সমুদ্র ভারী সুন্দর। পাহাড় আর সমুদ্র একসঙ্গে দেখা যায়। কাকাবাবুর ঘর থেকে ডান দিকে তাকালে দেখা যায়, একটা পাহাড় যেন সমুদ্র থেকে খানিকটা মাথা উঁচু করে আছে। ওই পাহাড়টার নাম 'ডলফিন্‌স নোজ', শুশুকের নাক, ঠিক সেইরকমই দেখতে লাগে।

দরজায় দু'বার টোকা পড়ল। কাকাবাবু ভাবলেন, ভোরবেলা একটি বেয়ারা বেড-টি দিয়ে গিয়েছিল, সে বোধ হয় কাপ-প্লেট নিতে এসেছে। কাকাবাবু বললেন, "কাম-ইন!"

আবার দু'বার টকটক শব্দ হল দরজায়।

দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে খুলে দিলেন।

বাইরে দাঁড়িয়ে আছে দুটি মাঝবয়েসী লোক। একজন সাদা শার্ট-প্যান্ট পরা, অন্যজনের একেবারে পুরোদস্তুর পুলিশের খাকি পোশাক, কোমরে রিভলভার, মাথায় টুপি পর্যন্ত। কাকাবাবু এদের আগে কখনও দেখেননি।

কাকাবাবু রীতিমতন বিরক্ত হয়ে বললেন, "কী ব্যাপার? আমি এখন কারও সঙ্গে দেখা করতে চাইনি।"

সাদা পোশাক পরা ব্যক্তিটি বলল, "দুঃখিত, মিঃ রায়চৌধুরী। আমরা ডিউটি করতে এসেছি। আপনার সঙ্গে আমাদের কিছু কথা আছে।"

কাকাবাবু বললেন, "কথা বলার তো একটা সময়-অসময় থাকে? আপনাদের কে পাঠিয়েছে? অনেক সময় পুলিশের লোকেরা নানা ব্যাপারে আমার পরামর্শ চায়।

"এখানকার পুলিশের কোনও বড়কর্তাকে তো আমি চিনি না। আপনাদের যে-ই পাঠাক, তাঁকে গিয়ে বলুন, এখানে আমি পুলিশের কোনও ব্যাপারে মাথা ঘামাতে রাজি নই। আমি একটু শান্তিতে থাকতে চাই।"

পুলিশ দু'জন পরস্পরের দিকে চোখাচোখি করল। খাকি পোশাক পরা পুলিশটি রুক্ষভাবে বলল, "দরজার কাছ থেকে সরে দাঁড়ান, আমরা ভেতরে ঢুকে কথা বলব।"

সাদা পোশাক পরা লোকটি হাত তুলে তাকে থামতে ইঙ্গিত করে বিনীতভাবে বলল, "মিঃ রায়চৌধুরী, আমাদের কেউ পাঠায়নি। আমরা স্পেশ্যাল স্কোয়াড থেকে আসছি। আমার নাম রঙ্গরাজ, আমার সঙ্গীর নাম রামা রাও।

"একটা কেসের ব্যাপারে আপনার সঙ্গে কথা বলা দরকার। আপনাকে সব খুলে বললে আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারবেন। আমরা কি ভেতরে গিয়ে বসতে পারি?"

রঙ্গরাজ তার জামার ভেতরের দিকের পকেট থেকে পরিচয়পত্র বার করে দেখাল।

কাকাবাবু দরজার কাছ থেকে সরে এলেন।

পুলিশ দু'জন দুটি চেয়ারে বসল।

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে আর-একটা চেয়ার টেনে নিলেন।

রঙ্গরাজ একটা নোটবুক আর কলম হাতে নিয়ে বলল, "আপনার নাম রাজা রায়চৌধুরী, আপনি কলকাতা থেকে এসেছেন, ঠিক?"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা আমার নাম জেনেশুনেই তো এসেছেন। আবার জিজ্ঞেস করছেন কেন?"

রঙ্গরাজ বলল, "এসব হচ্ছে রুটিন প্রশ্ন।"

কাকাবাবু বিদ্রূপের সুরে বললেন, "তার মানে, শুধু কথা বলতে নয়, আপনারা এই সকালবেলা আমাকে জেরা করতে এসেছেন?"

রঙ্গরাজ বলল, "তা একরকম বলতে পারেন। জানতে পারি কি, আপনি হঠাৎ এই সময় ভাইজাগ এসেছেন কেন ?"

কাকাবাবু খুব বিস্ময়ের ভান করে ভুরু তুলে বললেন, "সে কী কথা ? আমি স্বাধীন ভারতের একজন নাগরিক। কাশ্মির থেকে কন্যাকুমারিকা, যে-কোনও জায়গায় যখন খুশি যেতে পারি। এটা তো আমাদের নাগরিক অধিকার, তাই না ?"

রঙ্গরাজ বলল, "তা ঠিক। তবে, আরও অনেক জায়গা থাকতে আপনি হঠাৎ ভাইজাগ এলেন কেন, সেটাই জানতে চাইছি।"

কাকাবাবু বললেন, "হঠাৎ আবার কী ? ইচ্ছে হয়েছে, তাই এসেছি।"

রঙ্গরাজ বলল, "অর্থাৎ, কেন এসেছেন, তা আপনি জানাতে চান না।"

কাকাবাবু বললেন, "জানাতে আমি বাধ্য নই !"

রামা রাও এর মধ্যে পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরাতেই কাকাবাবু সেদিকে ফিরে বললেন, "যদি চুরুট টানতে চান, আপনাকে বাইরে যেতে হবে। আমি চুরুটের গন্ধ সহ্য করতে পারি না।"

রামা রাও তাড়াতাড়ি চুরুটটা অ্যাশট্রেতে ঠুকে-ঠুকে নিভিয়ে ফেলল।

তারপর কাকাবাবুর একটা ক্রাচ তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে দেখতে-দেখতে বলল, "আপনি কি সবসময় ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটেন ? না কি এর ভেতরটা ফাঁপা ?"

কাকাবাবু বুঝলেন, এই লোকদুটি তাঁর সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানে না।

সারা ভারতের বড়-বড় শহরের পুলিশের বড়কর্তারা তাঁকে চেনে। অন্য কোথাও এই ধরনের মাঝারি পুলিশরা তাঁকে জেরা করতে সাহস করত না।

ভাইজাগ শহরের পুলিশের ওপর মহলের কোনও অফিসার সম্পর্কে তিনি খোঁজখবর নিয়ে আসেননি। ভেবেছিলেন সেরকম কোনও দরকারও হবে না।

এই লোক দুটো শুধু-শুধু কিছুক্ষণ তাঁর সময় নষ্ট করে যাবে। শুধু সময় নষ্ট নয়, মেজাজ নষ্ট।

রঙ্গরাজ একটা ফোটোগ্রাফ বার করে কাকাবাবুর চোখের সামনে দেখিয়ে বলল, "এই লোকটিকে চিনতে পারেন ?"

পুরো চেহারা নয়, শুধু একটা মুখের ছবি। মুখে খোঁচা-খোঁচা দাড়ি, মাথায় অর্ধেক টাক, চোখ দুটো কোঁচকানো, ঠোঁটের ভঙ্গি নিষ্ঠুর ধরনের। সাধারণ চোর-ডাকাতের মতন।

কাকাবাবু একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বললেন, "না, চিনি না। কখনও দেখিনি।"

রঙ্গরাজ বলল, "ভাল করে ভেবে দেখুন। চেনেন না?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার স্মৃতিশক্তি ভাল। আমি মানুষের মুখ কখনও ভুলি না।"

রঙ্গরাজ বলল, "এই লোকটি কিন্তু আপনাকে চেনে। এর কাছ থেকেই আপনার ঠিকানা পেয়েছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে যদি কেউ চেনে, আমিও তাকে চিনব, এ তো বড় অদ্ভুত যুক্তি! মনে করুন, একটা চোর আপনার বাড়িতে চুরি করার জন্য রোজ লুকিয়ে-লুকিয়ে আপনার ওপর নজর রাখে, আপনার নাড়ি-নক্ষত্র সব জেনে নেয়, তা বলে কি আপনিও চোরটাকে চিনবেন?"

একটু হেসে তিনি আবার বললেন, "আমি নিজের সম্পর্কে বিশেষ কিছু বলতে চাই না। শুধু এইটুকু বলি, এমন অনেকেই আমাকে চেনে, যাদের আমি চিনি না।"

রামা রাও বলল, "অত বেশি কথার দরকার কী? রঙ্গরাজ, এই লোকটাকে এখন থানায় নিয়ে গেলেই তো হয়!"

রঙ্গরাজ বলল, "আগে আমি খানিকটা ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি।

"মিঃ রায়চৌধুরী, এই লোকটা একটা দাগি স্মাগলার। ভাইজাগ পোর্টের কাছে কাল রাত্তিরে পুলিশ ওকে তাড়া করে, শেষপর্যন্ত গুলি চালিয়ে আহত করে। লোকটার কাছে শুধু আপনার নাম-ঠিকানা নয়, এমন আরও প্রমাণ পাওয়া গেছে, যাতে বোঝা যায়, লোকটা আপনার সঙ্গেই দেখা করতে আসছিল। শুধু তাই-ই নয়, কয়েকবার কোঁতকা খাওয়ার পর লোকটা স্বীকার করেছে, এর আগে অন্তত একুশবার সে আপনার কাছে চোরাই জিনিস পৌঁছে দিয়েছে।"

রামা রাও বলল, "একুশবার! কোকেন স্মাগলিং, প্রায় কোটি টাকার কারবার।"

রঙ্গরাজ বলল, "লোকটি সব কথা স্বীকার করেছে। সুতরাং আপনাকে একবার থানায় যেতে হবে, এখনই। আপনি পোশাক-টোশাক পরে তৈরি হয়ে নিন।"

কাকাবাবু লোক দুটির মুখের দিকে তাকালেন। একটু-একটু হাসতে লাগলেন। তারপর হা-হা শব্দে অট্টহাসিতে ফেটে পড়লেন!

পুলিশ দু'জন নিরেট মুখ করে বসে আছে। তারা যেন হাসতে জানেই না!

কাকাবাবু হাসি থামিয়ে বললেন, "ইজ দিস সাম কাইন্ড অব আ জোক? আজ পয়লা এপ্রিল নাকি? সকালবেলা আমার সঙ্গে ইয়ার্কি করতে এসেছেন? আপনাদের কে পাঠিয়েছে সত্যি করে বলুন তো!"

রামা রাও আবার চুরুটটা ধরিয়ে ফেলেছে এর মধ্যে। একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল, "ইউ আর আন্ডার অ্যারেস্ট! স্বেচ্ছায় যেতে না চান, আপনাকে জোর করে ধরে নিয়ে যাব।"

রঙ্গরাজ বলল, "আরে না, না। জোর করতে হবে না। উনি এমনিই যাবেন আমাদের সঙ্গে।

"মিঃ রায়চৌধুরী, এই সকালবেলা বাড়িতে বউ-ছেলেমেয়ের সঙ্গে সময় না কাটিয়ে আপনার এখানে আমরা নিশ্চয়ই ঠাট্টা-ইয়ার্কি করতে আসিনি। আপনার বিরুদ্ধে অভিযোগ বেশ গুরুতর। আপনি তৈরি হয়ে নিন। আপনি এই শহরের কোনও বিশিষ্ট ব্যক্তিকে চেনেন?"

কাকাবাবু বললেন, "প্রোফেসর ভার্গব আমার বন্ধু। ইতিহাসের বিখ্যাত পন্ডিত। তাঁর সঙ্গে দেখা করার কথা আছে আজ দশটার সময়।"

পুলিশ দু'জন মাথা নাড়ল। তারা কেউ ভার্গবকে চেনে না।

কাকাবাবু জিভের চুকচুক শব্দ করে বললেন, "বোধ হয় ভার্গবের নাম করাটা আমার ভুল হল। আপনারা তাকেও স্মাগলার ভেবে জ্বালাতন করবেন হয়তো। নাঃ, এখানে আর কাউকে আমি চিনি না।"

রামা রাও বলল, "তা হলে চলো আমাদের সঙ্গে!"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ক্রাচটা দিন। আমি বাথরুমে গিয়ে পোশাক বদলে আসছি।"

রামা রাও বলল, "না, না, বাথরুম-টাথরুমে যাওয়া চলবে না। তোমাকে আর চোখের আড়াল হতে দিচ্ছি না।

"ক্রাচ দুটো আমার কাছে থাকবে, ভেঙে দেখব ভেতরে কিছু আছে কি না। এর মধ্যে তোমার ঘরটাও সার্চ করে দেখব!"

কাকাবাবু লাফাতে-লাফাতে গেলেন নিজের বিছানার কাছে। বালিশের তলা

থেকে টেনে বার করলেন রিভলভার।

রামা রাও তা দেখে ব্যস্তসমস্ত হয়ে নিজের কোমর থেকে রিভলভার বার করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে উলটে পড়ে গেল বেতের চেয়ারসুদ্ধু।

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, "আরে না, না, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই। আমি কি পুলিশের ওপর গুলি চালাব নাকি? আপনাদের দু'জনকে টিট করার ইচ্ছে থাকলে আমার রিভলভারেরও প্রয়োজন ছিল না। আপনারা বললেন, আমার ঘর সার্চ করবেন, তাই রিভলভারটা আগেই দেখিয়ে দিলাম। আমার লাইসেন্স আছে। আপনারা সত্যিই পুলিশ তো?"

রঙ্গরাজও কাকাবাবুর হাতে রিভলভার দেখে একধারে সিঁটিয়ে গিয়েছিল।

এবারে সোজা হয়ে বসে বলল, "সে-বিষয়ে আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন। আপনাকে আমরা থানাতেই নিয়ে যাব। সেখানে আপনার যা বলবার তা বলবেন।"

কাকাবাবু রিভলভারটা রঙ্গরাজের কোলের ওপর ছুড়ে দিয়ে বললেন,

"এটা আপনার কাছে রাখুন। আপনারা আমার নামে যে অভিযোগ এনেছেন, সেটা অস্বীকার করলে আপনারা আমার ওপর অত্যাচার করবেন? আমার পেট থেকে কথা বার করার জন্য আমার গায়ে আগুনের ছ্যাঁকা দেবেন।"

রঙ্গরাজ বলল, "প্রথমেই সত্যি কথা বলে দিলে সে সব কিছুর দরকার হবে না।"

রামা রাও কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে দাঁতে দাঁত ঘষে বলল, "কী করে মুখ খোলাতে হয় আমরা জানি। আঙুলে আলপিন ফোটালেই সবাই বাপ-বাপ করে সব কথা বলতে শুরু করে দেয়!"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আলপিন-টালপিন ফোটাবেন না, তাতে আমার খুব লাগবে। আপনারা যা জিজ্ঞেস করবেন, আমি সব উত্তর দেব।"

তারপর আবার ফিক করে হেসে ফেলে বললেন, "আমি এখনও বিশ্বাস করতে পারছি না যে, একটা ছিঁচকে অপরাধীর মতন পুলিশ আমায় থানায় ধরে নিয়ে যাচ্ছে! আমার বন্ধুরা শুনলে খুব মজা পাবে।"

রামা রাও চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "এতদিন ধরে স্মাগলিং করে আসছ, একবারও ধরা পড়োনি? কলকাতার পুলিশ তোমায় ধরতে পারেনি! আমরা

স্মাগলার'টাকে জেলে ভরব !"

কাকাবাবু বললেন, "ছিঃ, ওরকমভাবে কথা বলতে নেই। "আমি যে স্মাগলার, তা কি প্রমাণ হয়েছে ? প্রমাণ হওয়ার আগে কারও নামে দোষ দেওয়া পুলিশেরও উচিত নয়।"

তারপর রঙ্গরাজের দিকে ফিরে বললেন, "আপনারা আমার সম্পর্কে কিছুই জানেন না। নিজের মুখে আমার কিছুটা পরিচয় দিই ?

"আমি এক সময় ভারত সরকারের জিওলজিক্যাল সার্ভে দফতরের কর্তা ছিলাম। একটা অ্যাক্সিডেন্টে পা খোঁড়া হয়ে গেছে। তারপর বেশ কিছুদিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দফতর, অর্থাৎ সি বি আই-এর উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করেছি। অনেক রহস্য সমাধানের জন্য পুলিশকেও সাহায্য করেছি। এ-কারণে আমার অনেক শত্রু আছে। বোঝাই যাচ্ছে, সেরকম কেউ হয়রান করার জন্য আমাকে স্মাগলার সাজাচ্ছে।"

রঙ্গরাজ গম্ভীরভাবে বলল, "এসব কথা আমায় বলে লাভ নেই। থানায় গিয়ে বলবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "আপনারা চাইছেন যখন, নিশ্চয়ই আমি থানায় যাব। তার আগে ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিই ? আপনারা দু'জনেই আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খেতে পারেন। এই হোটেলে মাশরুম দিয়ে খুব ভাল ওমলেট বানায়।"

রামা রাও বলল, "আমরা পরের পয়সায় কিছু খাই না। তোমাকে আর ঠিক পাঁচ মিনিট সময় দেওয়া হচ্ছে তৈরি হওয়ার জন্য।"

কাকাবাবু এতক্ষণ পরে বিরক্তভাবে কাঁধ ঝাঁকালেন। এরা এতই ছোটখাট পুলিশ যে, কিছুই বুঝবে না।

গায়ে একটা জামা গলিয়ে নেওয়ার পর তিনি বললেন, "যাওয়ার আগে একটা টেলিফোন করতে পারি ?"

রামা রাও বলল, "না।"

রঙ্গরাজ বলল, "হ্যাঁ, করে নিন, তাতে আর কতক্ষণ লাগবে !"

কাকাবাবু ফোন তুলে দিল্লির একটা নম্বর চাইলেন।

সৌভাগ্যের বিষয় যে, সঙ্গে-সঙ্গে লাইন পাওয়া গেল।

কাকাবাবু তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মার গলার আওয়াজ পেয়ে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কী ব্যাপার, রাজা ? অনেকদিন তোমার পাত্তা

নেই, কোনও যোগাযোগ রাখোনি। আজ হঠাৎ এই অসময়ে যে ফোন করলে ?”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “অসময়ে কেন ?”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “রোজ এই সময়ে আমি যোগ-ব্যায়াম করি তা জানো না ?”

কাকাবাবু বললেন, “যোগ-ব্যায়াম। যোগ-নিদ্রায় তো ছিলে না।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “এ-সময়ে আমি টেলিফোনও ধরি না। আজ কেন যেন ধরে ফেললাম। যাকগে, কেমন আছ তাই বলো !”

কাকাবাবু বললেন, “কুড়ি মিনিট আগেও খুব ভাল ছিলাম। এখন ভাল নেই। কলকাতা থেকে নয় কিন্তু, আমি কথা বলছি ভাইজাগ থেকে !”

“সেখানে আবার কী করছ ? কেউ ডেকে নিয়ে গেছে বুঝি ?”

“না, বেড়াতেই এসেছি বলতে পারো। “তুমি তো প্রোফেসর ভার্গবকে চেনো, তাঁর সঙ্গে আরাকু ভ্যালিতে একটা জিনিস দেখতে যাওয়ার কথা আছে।”

“আরাকু ভ্যালি ? নাম শুনিনি। সেখানে কী আছে ?”

“সেসব কথা পরে হবে। এর মধ্যে একটা ছোট্ট ঝঞ্ঝাটে পড়েছি। দু'জন পুলিশের লোক আমাকে হোটেলে অ্যারেস্ট করতে এসেছে। এরা বলছে, আমি নাকি স্মাগলার !”

নরেন্দ্র ভার্মার অট্টহাসি পুলিশ দু'জনও শুনতে পেল।

নরেন্দ্র ভার্মা খুব ভাল বাংলা জানে। অধিকাংশ কথাই বলছে বাংলায়। মাঝেমধ্যে দু-একটা ইংরিজি শব্দ।

রামা রাও আর রঙ্গরাজ উৎকর্ণ হয়ে কথাগুলো শোনার চেষ্টা করছে, বাংলা কিছুই বুঝতে পারছে না।

নরেন্দ্র ভার্মা হাসি থামিয়ে প্রায় ধমক দিয়ে বলল, “রাজা রায়চৌধুরী, তুমি কি এই সকালবেলা আমার সঙ্গে রং-তামাশা করতে চাইছ ?”

কাকাবাবু বললেন, “না হে, রং-তামাশা নয়। “পুলিশ দু'জন এখানেই বসে আছে। প্রায় আমার ঘাড়ের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ছে। এরা বন্দর এলাকায় কাল একজন স্মাগলারকে ধরেছে, তার কাছে নাকি আমার নামে চিঠি পাওয়া গেছে। সে নাকি স্বীকার করেছে, এর আগে একবার আমাকে কোকেন

কাকাবাবুর
প্রথম অভিযান

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

কাকাবাবুর প্রথম অভিযান

সাপ্লাই করেছে। কোকেন জিনিসটা কীরকম, তা আমি চোখেই দেখিনি।”

“তোমাকে সত্যি-সত্যি ওরা ধরে নিয়ে যেতে এসেছে?”

“গোঁয়ারের মতন তাই তো জেদ ধরেছে দেখছি।”

“ওরা তোমাকে চেনে না? তোমার কীর্তি-কাহিনী কিছু শোনেনি?”

“নাঃ, এরা কিছুই জানে না। “দেখা যাচ্ছে অন্ধ্রপ্রদেশে আমার একটুও জনপ্রিয়তা নেই। তুমি কিছু করতে পারো?”

“সরাসরি পুলিশকে নির্দেশ দেওয়ার অধিকার আমার নেই। ওদের বড়কর্তাদের সঙ্গে কথা বলতে হবে। ওদের বলো, কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে। আমি কয়েক জায়গায় ফোনটোন করে দেখি।”

“এরা পাঁচ মিনিটও অপেক্ষা করতে রাজি নয়। আমাকে ব্রেকফাস্টও খেতে দিচ্ছে না। তুমি ওদের সঙ্গে কথা বলবে? যদি বুঝিয়ে দিতে পারো—”

“টেলিফোনে আমার কথা শুনে ওরা কী করে বিশ্বাস করবে যে, আমি নরেন্দ্র ভার্মা, না রাম-শ্যাম-যদু-মধু? এ তো মহা মুশকিল হল দেখছি! তোমাকে কেউ ফাঁসিয়েছে।”

“যে ফাঁসিয়েছে, সে আমার হাতে শাস্তি পাবেই। কিন্তু এখন কী করা যায়?”

“এক্ষুনি তো কিছু করা যাচ্ছে না। ওরা যখন নেবেই বলছে, তা হলে যাও, জেলখানার খিচুড়ি কেমন হয়, খেয়ে দেখো!”

“জেলের খাবার আমি কখনও খাইনি। এ-জীবনে খাওয়ার ইচ্ছেও নেই।”

ফোনটা রেখে দিয়ে, কাকাবাবু পুলিশ দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, “ঠিক আছে, চলুন আপনাদের থানাটা একবার দেখা যাক!”

॥ ২ ॥
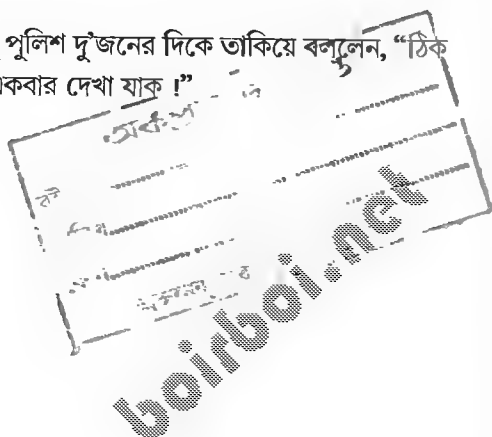
রামা রাও এর মধ্যে টেবিলের সবক'টা ড্রয়ার খুলে, বিছানা উলটে খাটের তলায় উঁকি মেরে দেখে নিয়েছে। কাকাবাবুর সুটকেস ঘাঁটাঘাঁটি করে আর কিছু না পেয়ে একটা গোল করে পাকানো শক্ত কাগজ তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল, "এটা কী ?"

কাকাবাবু বললেন, "খুলে দেখলেই বোঝা যাবে, ওটা একটা ম্যাপ।"

রঙ্গরাজ বলল, "কোথাকার ম্যাপ ?"

কাকাবাবু বললেন, "যে সমস্ত জায়গায় আমার স্মাগলিং ডেন আছে, সেইসব জায়গা ম্যাপে এঁকে রেখেছি।"

রঙ্গরাজ বলল, "এটা আমাদের সঙ্গে নিতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "নিতে চান নিতে পারেন, বেশি ভাঁজ করবেন না।"

রামা রাও একেবারে তাঁর পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে দেখে বললেন, "কী ব্যাপার, হাতকড়া পরাবেন নাকি ?"

রামা রাও বাঁকা সুরে বলল, "দরকার হলে তাও পরাতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "উঁহু, তা চলবে না। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ আছে, প্রকাশ্যে কাউকে হাতকড়া পরিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে না। তাতে মানহানির মামলা হতে পারে।

"শুনুন, আপনারা ডিউটি করতে এসেছেন, ওপরওয়ালার নির্দেশে আমাকে থানায় নিয়ে যাচ্ছেন, তাতে আমি আপত্তি করছি না। কিন্তু ডিউটির বাইরে গিয়ে কিছু করবেন না প্লিজ। আমার গায়ে হাত দেওয়া কিংবা ধাক্কাধাক্কি করার কোনও প্রয়োজন নেই। আগে থেকেই সাবধান করে দেওয়া ভাল, নইলে পরে আপনাদেরই এর ফল ভোগ করতে হবে।"

রামা রাও বলল, "যাঃ বাবা, এ যে আমাদেরই ধমকাচ্ছে দেখছি।"

কাকাবাবু হাত বাড়িয়ে আদেশের সুরে বললেন, "দেখি আমার ক্রাচ দুটো।"

রামা রাওয়ের দেওয়ার ইচ্ছে নেই, কিন্তু রঙ্গরাজ চোখের ইঙ্গিতে দিয়ে দিতে বলল।

কাকাবাবু ঘরের বাইরে এসে দরজায় চাবি দিলেন।

লিফ্‌টে করে নীচে নেমে কাউন্টারে চাবি জমা দিয়ে মণিকাকে বললেন,

"মিঃ ভার্গব নামে এক ভদ্রলোক আমার খোঁজ করতে পারেন। তাঁকে বলবে, আমি পরে যোগাযোগ করব।"

পুলিশের জিপ অপেক্ষা করছে বাইরে।

রামা রাও কাকাবাবুর পাশে বসে মনের আনন্দে চুরুট টানতে লাগল।

কাকাবাবু বিরক্তিতে নাক কুঁচকে রইলেন, কিন্তু বুঝলেন যে আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই।

ডক এলাকার থানাটি বেশ বড়। পুরনো আমলের বাড়ি, সামনের দিকে মোটা-মোটা থাম। শ্বেতপাথরে বাঁধানো দশ-বারোটা সিঁড়ি দিয়ে উঠে ভেতরে যেতে হয়।

পুলিশ দু'জন কাকাবাবুকে একটা ঘরে নিয়ে এল, সেখানে থানার বড়বাবু বসে আছেন, তাঁর টেবিলের সামনে অনেক মানুষের ভিড়, তিন-চারজন একসঙ্গে কথা বলছে।

কয়েকজনকে সরিয়ে কাকাবাবুকে টেবিলের সামনে দাঁড় করানো হল।

রামা রাও বলল, "সার, এই সেই স্মাগলিং-এর কেস। রাজা রায়চৌধুরীকে অ্যারেস্ট করে এনেছি।"

বড়বাবু মুখ তুলে তাকালেন। ভাল করে দেখলেনও না কাকাবাবুকে, বললেন, "গারদে ভরে দাও!"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়ান, আমার কিছু বলবার আছে। আমাকে মিথ্যে অভিযোগে ধরা হয়েছে। আমার পরিচয়টা একবার শুনুন।"

বড়বাবু একটা কী কাগজ পড়তে-পড়তে বললেন, "বিকেলে, বিকেলে, এখন আমি ব্যস্ত আছি।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে আদালতে পাঠাবেন তো। আমি জামিন চাইব। আমার একজন উকিল দরকার।"

বড়বাবু আবার বললেন, "বিকেলে, বিকেলে।"

কাকাবাবু খানিকটা উত্তেজিতভাবে বললেন, "বিকেলে মানে? "আজ সকালেই আমাকে কোর্টে পাঠানো উচিত।"

বড়বাবু এবার মুখ তুললেন। কাকাবাবুকে গ্রাহ্যই করলেন না। পেছনে দাঁড়ানো রামা রাওকে ধমক দিয়ে বললেন, "এখানে দাঁড়িয়ে মজা দেখছ নাকি? বললাম না, আসামিকে গারদে ভরে দাও! শুধু-শুধু সময় নষ্ট!"

অন্য লোকরা আবার কথা বলতে শুরু করে দিল। রামা রাও কাকাবাবুর বাহু চেপে ধরে বলল, "চলো!"

এবার কাকাবাবুকে আনা হল আর-একটি ঘরে। এ-ঘরে ভিড় নেই, বড় টেবিলের ওপাশে একজন লোক বসে আছে, সামনে একটা লম্বা খাতা।

রামা রাও বলল, "তোমার সঙ্গে যা আছে, এখানে জমা দাও। খালাস হলে আবার ফেরত পাবে।"

কাকাবাবু পকেট থেকে টাকাপয়সা, রুমাল, সুটকেসের চাবি ইত্যাদি বার করে টেবিলে রাখলেন। রঙ্গরাজের দিকে তাকিয়ে বললেন, "আমার রিভলভারটার কথাও খাতায় লিখিয়ে দিন।"

রঙ্গরাজ বলল, "তা দিচ্ছি। আপনার ক্রাচ দুটোও এখানে রাখুন।"

কাকাবাবু বললেন, "ক্রাচ ছাড়া আমি হাঁটতে পারি না। এ দুটো আমার সঙ্গে থাকবে?"

রঙ্গরাজ বলল, "ও দুটো অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা যেতে পারে। ও-ধরনের কোনও জিনিস জেলের মধ্যে নিয়ে যাওয়ার নিয়ম নেই।"

কাকাবাবু বললেন,

"তা হলে আমি হাঁটব কী করে?"

রামা রাও বলল, "বাঁদরের মতন লাফিয়ে-লাফিয়ে!"

এর পর সে কাকাবাবুর ঘাড়ে ধাক্কা দিতে-দিতে বলল, "এবার ভেতরে চলো।"

কাকাবাবু কঠিন মুখ করে বললেন, "ধাক্কা দিতে বারণ করেছি না? আমি এমনিই যাচ্ছি।"

রামা রাও কাষ্ঠ হাসি দিয়ে বলল, "বড়বাবু কী বললেন, শোনোনি? এখন তুমি আসামি!"

কাকাবাবু বললেন, "আসামি মানে কী? অপরাধী? সেটা এখনও প্রমাণিত হয়নি। আমি অপরাধী কি না তা ঠিক করবেন আদালতের বিচারক। পুলিশের বিচার করার অধিকার নেই। "এখন সকাল ন'টা বাজে, আমাকে আজই কোর্টে পাঠানো উচিত ছিল।"

রামা রাও একটা খুব খারাপ গালাগালি দিয়ে বলল, "তুমি বড্ড বকবক করো।"

একটা মস্ত লোহার গেট খুলে তার মধ্যে কাকাবাবুকে ঠেলে দিল সে।

জেলখানা কিংবা থানার গারদের ভেতরটা কেমন হয়, তা কাকাবাবু আগে কখনও দেখেননি। তাঁর ধারণা ছিল, এক-একজনের জন্য এক-একটা খুপরি-খুপরি অন্ধকার ঘর থাকে।

এখানে কিন্তু তা নয়। একটাই বেশ লম্বা ঘর, তার মধ্যে দশ-বারোজন লোক কেউ দেওয়ালে হেলান দিয়ে বসে আছে, কেউ মাটিতে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

ঘরটা অসম্ভব নোংরা। দেওয়ালে থুতু, পানের পিকের দাগ, একটা দিক জলে ভাসছে, তার মধ্যে ফরফর করছে আরশোলা। সব মিলিয়ে একটা বিকট গন্ধ।

রামা রাওয়ের ধাক্কা খেয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তে গিয়েও কাকাবাবু দেওয়াল ধরে সামলালেন কোনওরকমে।

পেছনে লোহার গেটটা সশব্দে বন্ধ হয়ে গেল। অসম্ভব রাগে কাকাবাবুর সারা গা থেকে যেন গরম ধোঁয়া বের হচ্ছে। এরকম একটা বিশ্রী অবস্থার মধ্যে তিনি জীবনে কখনও পড়েননি।

থানার বড়বাবু লোকটা এমনই অভদ্র যে, একটা কথাও শুনল না। যাকে তাকে ধরে আনলেই গারদে পোরা যায়?

যে ব্যক্তি কোনও দোষ করেনি, তাকেও এইরকম একটা নোংরা ঘরে থাকতে হবে? প্রত্যেক লোকেরই উকিলের সাহায্য নেওয়ার অধিকার আছে। এরা তাঁকে কোনও সুযোগই দিল না!

দুর্জন-দুশমনদের পাল্লায় পড়ে কাকাবাবুকে এর চেয়ে অনেক খারাপ জায়গায় থাকতে হয়েছে। মৃত্যুর মুখে পড়েছেন কতবার। তখনও এত রাগ হয়নি, কারণ সেইসব লোকেরা ছিল শত্রুপক্ষ।

কিন্তু সরকারি পুলিশের কাছ থেকে সামান্য ভদ্রতাটুকুও আশা করা যাবে না?

অন্য কয়েদিদের দিকে কাকাবাবু তাকিয়ে দেখলেন। কেউ লুঙ্গি আর গেঞ্জি পরা, কারও গায়ে চিটচিটে ময়লা জামা, একজন ঘ্যাস-ঘ্যাস করে দাদ চুলকোচ্ছে। দেখলে মনে হয়, সবাই ছোটখাটো চোর বা পকেটমার, একজনের কাঁধে রক্ত-ভেজা ব্যাণ্ডেজ।

কয়েকজন কাকাবাবুকে ঢুকতে দেখে হ্যা-হ্যা করে হেসে তামিল আর তেলুগু ভাষায় কী যেন বলে উঠল, কাকাবাবু কিছুই বুঝতে পারলেন না।

তাঁর সারা মুখ ঘামে ভিজে গেছে। রাগে, অপমানে ছটফট করছেন। হঠাৎ তিনি চোখ বুজে ফেললেন।

তিনি মনে-মনে নিজেকেই বললেন, এত রাগ ভাল নয়। বেশি রাগলে নিজেরই ক্ষতি হবে। এই কারাগার ভেঙে এক্ষুনি বেরিয়ে যাওয়া যাবে না কিছুতেই। অপেক্ষা করতে হবে। দেখা যাক, শেষপর্যন্ত কী হয়।

নরেন্দ্র ভার্মাও কোনও সাহায্য করতে পারল না। সে কি শেষপর্যন্ত ভাবল, আমি তার সঙ্গে রসিকতা করছি ?

খুব বড় একটা নিশ্বাস ফেলে বুকটা হালকা করলেন কাকাবাবু। মেজাজ শান্ত করার জন্য গান সবচেয়ে ভাল ওষুধ।

এই পরিবেশটার কথা ভুলে যেতে হবে। মনে করতে হবে, এখানে কাছাকাছি আর কেউ নেই।

দেওয়ালে ঠেস দিয়ে বসে পড়লেন তিনি। চক্ষুদুটি বোজাই রইল। গুন্‌গুন্ করে শুরু করলেন তাঁর প্রিয় গান। সুকুমার রায়ের লেখা, তাঁর নিজের সুর :

শুনেছো কী বলে গেল, সীতানাথ বন্দ্যো
আকাশের গায়ে নাকি টক টক গন্ধ ?
টক টক থাকে নাকো হলে পরে বৃষ্টি
তখন দেখেছি চেটে, একেবারে মিষ্টি !

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি এই গানটাই গাইতে লাগলেন অনেকবার। আশেপাশে কে কী বলছে, তিনি কিছুই শুনছেন না। গাইতে-গাইতে এক সময় তাঁর ঘুম এসে গেল। রাগ কমাবার পক্ষে ঘুমও খুব ভাল জিনিস। তাঁর অনেকটা ইচ্ছে-ঘুম। ইচ্ছে করলে তিনি সারা দিন-রাত ঘুমোতে পারেন, আবার দরকার হলে একেবারে না ঘুমিয়ে কাটাতে পারেন এক-দু'দিন।

ঘুমোচ্ছেন, মাঝে-মাঝে একটু জাগছেন, আবার ঘুমোচ্ছেন।

এইভাবে সারা দুপুর, বিকেল পেরিয়ে গেল।

এক সময় তাঁর কাঁধ ধরে কে যেন ঝাঁকাল। আর তিনি শুনতে পেলেন, বাংলায় কে যেন বলছে, "বন্দি, জেগে আছ ? বন্দি, জেগে আছ ?"

প্রথমে কাকাবাবু ভাবলেন, তিনি স্বপ্ন দেখছেন। এখানে কে বাংলায় কথা বলবে ?

তারপর চোখ মেলে দেখলেন, একজন কয়েদি তাঁকে ধাক্কাচ্ছে।

সে আঙুল তুলে লোহার গেটটার দিকে দেখিয়ে দিল।

সেই গেটের ওপাশে পাক্কা সাহেবদের মতন সুট-টাই ও মাথায় টুপি পরে দাঁড়িয়ে আছে একজন ছিপছিপে লম্বা লোক।

সে বলল, "কী গো বন্দি, ঘুম ভাঙল !"

খুশিতে কাকাবাবুর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল। এ যে তাঁর বন্ধু নরেন্দ্র ভার্মা।

কাকাবাবু উঠে এসে প্রথমেই জিজ্ঞেস করলেন, "নরেন্দ্র, তুমি এত তাড়াতাড়ি কী করে দিল্লি থেকে চলে এলে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার জন্য কি কম ঝঞ্ঝাট করতে হয়েছে। সঙ্গে-সঙ্গে প্লেনের টিকিট পাওয়া যায় নাকি ? শেষ পর্যন্ত পাইলটের পাশে বসে চলে এলাম। এখানে পৌঁছেছি ঠিক দু' ঘণ্টা আগে। এর মধ্যে অনেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করতে হয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে এই নরকের মতন জায়গাটায় আর কতক্ষণ থাকতে হবে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা রায়চৌধুরীকে জেলে আটকে রাখে, এমন কারও সাধ্য আছে !"

একজন সেপাই গটগট করে এসে লোহার গেটের তালা খুলে দিল এবং কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে একটা লম্বা সেলাম দিল।

অন্য কয়েদিরা চ্যাঁচামেচি করে কী যেন বলে উঠল। বোঝা গেল না। বোধ হয় একজন এত তাড়াতাড়ি ছাড়া পাওয়ায় তারা আপত্তি জানাচ্ছে।

কাকাবাবু গেটের বাইরে পা দিয়ে বললেন, "এসব তোমরা কী শুরু করেছ ? আমার এতখানি সময় নষ্ট হল। বিনা অপরাধে তোমরা যাকে খুশি গারদে ভরে দেবে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা হকচকিয়ে বললেন, "আরে, আমাকে বকছ কেন ? আমি তোমায় গারদে ভরেছি নাকি ?"

কাকাবাবু বললেন, "তোমরা পুলিশরা কি যা খুশি করতে পারো নাকি ? এ দেশটা কি হিটলারের জার্মানি হয়ে গেল ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি কি পুলিশ নাকি ? সি বি আই-এর লোকদের ঠিক পুলিশ বলা যায় না। আমরা কেন্দ্রীয় তদন্তকারি। পুলিশের মধ্যে তো নানা ধরনের লোক থাকে, মাঝে-মাঝে দু-একটা ভুল হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "এই থানার বড়বাবু কোথায় ? তার সঙ্গে আমি কথা বলতে চাই।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "সে বেচারি সব জানবার পর ভয়ে আর লজ্জায় একেবারে কাঁচুমাচু হয়ে আছে। প্রথমেই তোমার সামনে আসতে চায়নি। চলো, তার কাছে যাই।"

কাকাবাবু বললেন, "আগে আমার জিনিসপত্র আদায় করো। ক্রাচ দুটো

দাও। রিভলভারটা দাও!”

বড়বাবু সেই আগের ঘরটাতেই বসে আছেন, এখন সে-ঘরটা একেবারে ফাঁকা।

কাকাবাবুকে দেখেই উঠে দাঁড়িয়ে নমস্কার করে বললেন, “আসুন, সার, বসুন সার, মাপ করে দেবেন সার। আমার লোকজন ঠিক বুঝতে পারেনি।”

কাকাবাবু কড়া গলায় বললেন, “আমি আপনার কাছে নিজের পরিচয় দিতে চেয়েছিলাম, আপনি শুনলেনই না।”

বড়বাবু বললেন, “ভুল হয়ে গেছে, সার। সকাল থেকেই এত লোকজন, এত কাজের চাপ, মাথার ঠিক রাখতে পারি না।”

কাকাবাবু বললেন, “হোটেল থেকে কাউকে অ্যারেস্ট করে আনা কি তুচ্ছ ব্যাপার? যতই কাজ থাক, আপনি তার একটা কথাও শুনবেন না?”

বড়বাবু বললেন, “বললাম তো সার, ভুল হয়ে গেছে। ক্ষমা করে দিন!”

একজন কেউ বারবার ক্ষমা চাইলে তার ওপর আর তর্জন-গর্জন করা যায় না।

এবার কাকাবাবু নিজেকে অনেকটা সংযত করে বললেন,

“আমি রাজা রায়চৌধুরী হিসেবে বিশেষ কোনও সুবিধে চাইছি না। যে-কোনও লোক যদি বাইরে থেকে এখানে বেড়াতে আসে, হুট করে তাকে হোটেল থেকে এনে গারদে পোরা যায়? আমাকে স্মাগলার বলে সন্দেহ করলে আমার ওপর পুলিশ কয়েকদিন নজর রাখতে পারত, হাতেনাতে ধরে কিছু প্রমাণ পেলে তবেই অ্যারেস্ট করা উচিত ছিল। মনে করুন, কোনও একটা লোকেব পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গেল, যাতে লেখা আছে যে, এই থানার ও. সি. এক লক্ষ টাকা ঘুষ খেয়েছে কিংবা একটা মানুষ খুন করেছে। সেই চিঠি পেয়েই আপনাকে ধরে গারদে পুরে দেবে কেউ? সত্যি-মিথ্যে যাচাই করবে না?”

বড়বাবু বললেন, “আপনি ঠিকই বলেছেন। একটা মারাত্মক ভুল হয়ে গেছে। আপনাকে কষ্ট দেওয়ার জন্য আমরা খুবই দুঃখিত। তবে ব্যাপার কী জানেন সার, যে স্মাগলারটা ধরা পড়েছে, তাকে জেরা করার পর এমনভাবে বলতে লাগল যে কবে, কোথায়, কতবার আপনার কাছে জিনিস পাচার করেছে যে, শুনলে মনে হবে সে সত্যি বলছে। অবশ্য তার মুখের কথা বিশ্বাস করা আমাদের উচিত হয়নি।”

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, “সেই লোকটি কোথায়? তার সঙ্গে আমরা

দেখা করতে চাই।"

বড়বাবু বললেন, "সে লোকটির নাম হরেন মণ্ডল। তার পায়ে গুলি লেগেছে। তাকে হাসপাতালে রাখা হয়েছে, দু'জন গার্ড পাহারা দিচ্ছে সেখানে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তা হলে একবার হাসপাতালে যাওয়া যাক।"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে আর একটা কাজ বাকি আছে এখানে। বড়বাবু, আপনার রামা রাও নামে অফিসারটিকে একবার ডাকুন তো।"

তখনই হাঁকডাক করে রামা রাও-এর খোঁজ করা হল। সে এসে বড়বাবুকে স্যালুট করে দাঁড়াল।

বড়বাবু বললেন, "ওহে তোমরা ভুল লোককে ধরে নিয়ে এসেছ। এঁর কাছে মাপ চেয়ে নাও।"

রামা রাও ঠিক বুঝতে না পেরে ঘাড় গোঁজ করে দাঁড়িয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "মাপ চাইবার দরকার নেই। ওর একটু ওষুধ দরকার।"

তিনি উঠে গিয়ে রামা রাওয়ের পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "পুলিশ হয়েছ বলে তোমার অনেক ক্ষমতা, তাই না ? যাকে-তাকে ঘাড়ধাক্কা দিতে পারো। নিজে কখনও ঘাড়ধাক্কা খেয়েছ ? দেখো তো কেমন লাগে ?"

কাকাবাবু রামা রাওয়ের ঘাড়ে ডান হাত রেখে এমন কঠিন একটা ধাক্কা দিলেন যে, সে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

সে বেশ লম্বা-চওড়া জোয়ান পুরুষ, কাকাবাবুর মতো একজন খোঁড়া লোকের গায়ে যে এত জোর, তা সে কল্পনাও করেনি।

থানার মধ্যে কোনও পুলিশের গায়ে হাত দেওয়ার মতন ঘটনা আগে কেউ দেখেনি।

রামা রাও ক্রুদ্ধ ভাবে ও. সি.-র দিকে একবার তাকিয়ে তেড়ে গেল কাকাবাবুর দিকে।

ও. সি. চট করে কাকাবাবুকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে পড়ে হাত তুলে বললেন, "ব্যস, ব্যস, হয়েছে, হয়েছে। শোধবোধ হয়ে গেছে।

"শোনো রাও, মিস্টার রায়চৌধুরী একজন বিখ্যাত মানুষ, ওঁকে এইভাবে ধরে আনা ঠিক হয়নি। আমাদের ক্ষমা চাওয়া উচিত।"

রামা রাও গায়ের ধুলো ঝাড়তে লাগল।

নরেন্দ্র ভার্মা ব্যস্ত হয়ে বললেন,

"এখানে আর সময় নষ্ট করে কী হবে ? হাসপাতালে গিয়ে সেই লোকটার সঙ্গে কথা বলা যাক।"

বড়বাবু বললেন, "আমি গাড়ির ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। সেই গাড়িতে চলে যান।

"পুলিশ কমিশনার ফোন করেছিলেন, তিনি আপনাদের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করার নির্দেশ দিয়েছেন।"

কাকাবাবু বললেন,

"আমাকে যারা পুলিশে ধরাবার চেষ্টা করেছে, যাদের জন্য আমার একটা দিন নষ্ট হল, তাদের আমি ঠিক খুঁজে বার করব। তারা কঠিন শাস্তি পাবে।"

বাইরে বেরিয়ে গাড়িতে ওঠবার পর নরেন্দ্র ভার্মা হেসে বললেন,

"রাজা, তুমি এখনও রাগে ফুঁসছ ! অত রাগ ভাল নয়। থানার মধ্যে ওই লোকটাকে ঘাড়ধাক্কা না দিলে কি চলত না।"

কাকাবাবু বললেন, "আমার সহজে রাগ হয় না। কিন্তু একবার রাগ চড়ে গেলে সহজে যেতে চায় না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এবার একটু অন্য কথা বলো। এখানে তুমি সত্যি-সত্যি এসেছ কেন ? শুধু বেড়াতে ?"

কাকাবাবু বললেন, "সারাদিন আমি কিচ্ছু খাইনি। আগে ভাল করে খেতে হবে, তারপর অন্য কথা।"

নরেন্দ্র ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "সে কী, দুপুরে কিছু খেতে দেয়নি ? লপ্‌সি না খিচুড়ি। কী যেন দেয় ?"

কাকাবাবু বললেন,

"দিয়েছিল বোধ হয় কিছু। আমি চোখ বুজে ছিলাম। আমি জেলের খাবার খাব না বলেছিলাম না ?"

"যদি আমার আসতে দেরি হত ? তোমাকে জেল থেকে ছাড়াতেও দু'-তিনদিন লেগে যেত ?"

"তা হলে দু'-তিনদিনই না খেয়ে থাকতাম।"

"এ-রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী এখন ভাইজাগে রয়েছেন। সেইজন্য পুলিশ কমিশনার খুব ব্যস্ত, তিনি নিজে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেননি। আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। কমিশনার সাহেব তোমার সব কথা জানেন। উনি বললেন, একটা মিথ্যে অভিযোগ দিয়ে তোমার পেছনে যারা পুলিশ লেলিয়ে দিয়েছে, তাদের নিশ্চয়ই একটা কিছু মতলব আছে। তোমাকে আটকে রাখতে চায়, কারা চাইছে এবং কেন ?"

"সেসব পরে ভেবে দেখা যাবে। আগে কিছু খেয়ে নিয়ে পেট ঠাণ্ডা করি।"

শহরের মধ্যে একটা রেস্তরাঁয় গিয়ে বসা হল।

ভেতরটা অন্ধকার-অন্ধকার, প্রত্যেক টেবিলে শুধু মোমবাতি জ্বলছে। লোকজন যারা বসে আছে, তাদের মুখ দেখা যায় না।

একেবারে কোণের একটা টেবিলে বসলেন ওঁরা দু'জন।

বেয়ারাকে ডেকে নরেন্দ্র ভার্মা একগাদা খাবারের অর্ডার দিতে যাচ্ছিলেন, কাকাবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আরে, আরে, তুমি করছ কী ? খিদে পেয়েছে বলে কি আমি রাক্ষসের মতন খাব ? একটা মাশরুম-ওমলেট, দু'খানা টোস্ট আর এক কাপ চা-ই যথেষ্ট।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমার জন্য একটা বড় গ্লাস লস্যি !"

কাকাবাবু টেবিলে রাখা জলের গ্লাস তুলে এক চুমুকে শেষ করে বললেন, "সকাল থেকে এই প্রথম জল খেলাম। হোটেলে গিয়ে স্নান করতে হবে। থানার গারদটা এত নোংরা যে এখনও আমার গা ঘিনঘিন করছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমার খুব দুর্ভোগ গেল যা হোক। মিছিমিছি এই ঝঞ্ঝাট।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি যে এত তাড়াতাড়ি চলে আসবে দিল্লি থেকে, তা আমার শত্রুপক্ষ ভাবতেই পারেনি। দিল্লি থেকে যে আমি এরকম সাহায্য পেতে পারি, তাও বোধ হয় ওরা জানে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুলিশ কমিশনারও সেই কথা জানালেন। এখানে স্মাগলিং খুব বেড়ে যাওয়ায় পুলিশ থেকে তাদের ধরার একটা বড়রকম অভিযান শুরু হয়েছে। স্মাগলিং-এর সঙ্গে যাদের সামান্য সম্পর্ক আছে, তাদের ধরা হচ্ছে। সেইজন্যই তোমার ব্যাপারটা বিশ্বাসযোগ্য ভাবে সাজানো হয়েছিল। একজন ধরা-পড়া স্মাগলারের পকেটে তোমার নামে চিঠি। তুমি হোটেলে থাকো, বাইরের লোক, পুলিশের সন্দেহ তো হবেই। তুমি যদি দিল্লিতে আমাকে ফোন করে না পেতে, কিংবা এরা যদি তোমাকে টেলিফোন করতেই না দিত, তা হলে তোমাকে বেশ কিছুদিন জেলে থাকতে হত।"

কাকাবাবু বললেন, "কারা এই মতলবটি করেছিল, তাদের খুঁজে বার করতে হবে। হাসপাতালের লোকটাকে জেরা করলেই কিছু জানা যাবে !"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, তোমাকে তো আমি খুব ভাল করেই চিনি ! তোমাকে যারা বিরক্ত করে, তাদের শাস্তি না দিয়ে তুমি শান্ত হবে না।

কিন্তু মুশকিল হচ্ছে, আমি এখানে থাকতে পারছি না। কাল সকালেই আমাকে বম্বে চলে যেতে হবে। সেখান থেকে আমেদাবাদ। খুব জরুরি কাজ, যেতেই হবে। তুমি একা-একা বিপদের ঝুঁকি নিতে যেয়ো না প্লিজ! আমি চার-পাঁচদিন পর ফিরে আসব। সেই ক'টা দিন তুমি চুপচাপ হোটেলে বসে থেকো, কিংবা কলকাতায় ফিরে যেতে পারো।"

কাকাবাবু কিছু না বলে মুচকি হাসলেন।

বেয়ারা এসে খাবার দিয়ে গেল।

বাইরে থেকে যখন লোক আসছে বা কেউ বের হচ্ছে, তখন দরজাটা খোলায় আলো এসে পড়ছে ভেতরে। আবার অন্ধকার।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি আরাকু ভ্যালি না কী একটা ভ্যালিতে যাওয়ার কথা বলেছিলে, সেখানে কী ব্যাপার?"

কাকাবাবু বললেন, "সেখানে চোর-ডাকাত ধরার কোনও ব্যাপার নেই। প্রোফেসর ভার্গব কিছু ঐতিহাসিক মূর্তি আবিষ্কার করেছেন, সেগুলো দেখতে যাওয়ার কথা আছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমার মনে হচ্ছে ভাইজাগে স্মাগলাররা আর চোর-ডাকাতরা বড়রকম কিছু একটা ঘটাবে। এর মধ্যে তুমি এসে পড়েছ। ওদের ধারণা, তুমি ওদের বাধা দিতে এসেছ। তাই ওরা তোমাকে সরাতে চায়।"

কাকাবাবু বললেন, "চোর-ডাকাত বা স্মাগলারদের নিয়ে আমি মাথাই ঘামাই না। আমি এসেছি মূর্তি দেখার শখে।"

এই সময় দরজা ঠেলে একটা লোক ঢুকল। তার পেছন দিকটায় আলো বলে মুখ দেখা গেল না।

কয়েক পা দৌড়ে এসে সে কাকাবাবুর দিকে কিছু একটা জিনিস খুব জোরে ছুড়ে মারল। ঠিক তখনই কাকাবাবু চায়ের কাপটা তুলেছেন চুমুক দেওয়ার জন্য।

সেই জিনিসটা এসে লাগল চায়ের কাপে, কাপটা ভেঙে কয়েক টুকরো হয়ে গেল, সব চা-টা ছড়িয়ে গেল টেবিলে।

সেই জিনিসটা একটা মস্ত বড় ছুরি। কাকাবাবু ঠিক সময় কাপটা না তুললে ছুরিটা তাঁর বুকে বিঁধে যেত।

ব্যাপারটা বুঝতে কয়েক সেকেন্ড সময় লাগল।

লোকটা পেছন ফিরে পালাচ্ছে। নরেন্দ্র ভার্মা বাঘের মতন তাড়া করে গেলেন লোকটিকে, রেস্তরাঁর অন্য লোকজন হইহই করে উঠল।

কাকাবাবুর জামায়-প্যান্টে চা পড়ে গেছে।

তিনি একটুও উত্তেজিত না হয়ে একটা ন্যাপকিন দিয়ে ভিজে জায়গাগুলো মুছতে লাগলেন।

নরেন্দ্র ভার্মা ফিরে এলেন একটু পরেই। কাকাবাবুর টেবিল ঘিরে অনেকে দাঁড়িয়ে নানারকম প্রশ্ন করছে, কাকাবাবু কোনও উত্তর দিচ্ছেন না।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"নাঃ, লোকটাকে ধরা গেল না। রাস্তা দিয়ে একটা মিছিল যাচ্ছে, লোকটা শট করে মিছিলের ওপারে চলে গিয়ে ভিড়ে মিশে গেল।"

কাকাবাবু ছুরিটা দু' হাতে ধরে বললেন, "বেশ ধার আছে। জানো নরেন্দ্র, আমার ক্রমশ বিশ্বাস হয়ে যাচ্ছে যে, আমাকে কেউ কক্ষনও মারতে পারবে না। আমার ইচ্ছা-মৃত্যু!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দিনের বেলা এত লোকের মাঝখানে তোমাকে মারতে এসেছিল। ওরা বেপরোয়া হয়ে গেছে। "রাজা, তোমার আর বাইরে থাকা চলবে না। হোটেলে ফিরে চলো। সেখানে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করব।"

কাকাবাবু উঠে দাঁড়াতে-দাঁড়াতে বললেন, "আগে হাসপাতালে চলো। সেই লোকটাকে দেখে আসি।"

বিল মিটিয়ে দিয়ে বাইরে এসে নরেন্দ্র ভার্মা একবার চারদিক দেখে নিলেন।

কী একটা ধর্মীয় মিছিল এখনও চলেছে, গাড়ি-ঘোড়া সব থেমে আছে। এর মধ্যে দিয়ে যাওয়াও যাবে না।

গাড়ির মধ্যে বসে ওঁরা অপেক্ষা করতে লাগলেন। মিছিলটা শেষ হওয়ার পর গাড়ি স্টার্ট দিল।

হাসপাতালে পৌঁছে একটা দুঃসংবাদ শোনা গেল।

কোনও আসামি আহত বা অসুস্থ হলে তাকে হাসপাতালে রাখা হলেও তার বেডের পাশে পুলিশ পাহারা থাকে। এখানে হরেন মণ্ডল নামে স্মাগলারটির জন্যও দু'জন পুলিশ ছিল। গুলি লেগে হরেনের পা খোঁড়া হয়ে গেছে। তবু, ঠিক এক ঘণ্টা আগে বাথরুম যাওয়ার নাম করে হরেন পুলিশের চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে গেছে। খোঁড়া পা নিয়ে সে হাসপাতালের তিনতলা থেকে কী করে পালাল, কেউ জানে না।

॥ ৩ ॥

নরেন্দ্র ভার্মার শত অনুরোধেও কাকাবাবু তখনই হোটেলে ফিরে যেতে রাজি হলেন না। তিনি তাঁর বন্ধু ভার্গবের সঙ্গে দেখা করতে যাবেনই।

অধ্যাপক ভার্গবের বাড়ি শহর ছাড়িয়ে খানিকটা দূরে। ঋষিকোণ্ডা বিচে যাওয়ার পথে একটা ছোট টিলার ওপারে ছবির মতন বাগানঘেরা সুন্দর বাড়ি। একেবারে বাড়ির গেট পর্যন্ত গাড়ি উঠে আসার রাস্তা আছে। এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায়।

সন্ধে হয়ে এসেছে। গাড়ি থেকে নেমে সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আহা, কী চমৎকার হাওয়া এখানে! দেখছ নরেন্দ্র, সমুদ্রের ঢেউয়ের মাথায় ফসফরাস রয়েছে, অন্ধকারে মালার মতন দেখাচ্ছে। আমাদের কবি মাইকেল লিখেছেন,

"কী সুন্দর মালা আজি পরিয়াছ গলে প্রচেতঃ..."
অবশ্য এখানে মালা মানে অন্য মালা। 'প্রচেতঃ' মানে 'সমুদ্র', জানো তো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আশ্চর্য, একটু আগে একজন তোমায় খুন করতে এসেছিল, আর এর মধ্যে তোমার কবিতা মনে পড়ছে?"

কাকাবাবু বললেন, "কেউ আমার দিকে ছুরি বা গুলি ছুড়লে আমি তেমন গ্রাহ্য করি না। এরকম তো কতবার হয়েছে। কিন্তু বিনা দোষে পুলিশ যে আমাকে জেলে ভরে দিয়েছিল, সেটাতেই খুব রাগ হয়েছিল।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "যাক, সেটা তো মিটে গেছে। পুলিশ আর তোমাকে বিরক্ত করবে না, বরং যা সাহায্য চাইবে তাই পাবে।"

কাকাবাবু বললেন, " 'জীবন মৃত্যু পায়ের ভৃত্য চিত্ত ভাবনাহীন', এটা কার লেখা বলতে পারো? ওঃ, তুমি তো বাংলা পড়ো না। এটা রবীন্দ্রনাথের।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমায় দেখছি কবিতায় পেয়েছে। রাজা, তোমার জন্য আমার খুব চিন্তা হচ্ছে। আমি থাকতে পারব না, কাল সকালে আমাকে চলে যেতেই হবে।"

কাকাবাবু হাসিমুখে বললেন,

"যাও না, অত চিন্তা কীসের? তুমি থাকলেও সবসময় আমাকে পাহারা

দিতে নাকি ? আমার কিছু হবে না।"

বাগান পেরিয়ে এসে বাড়ির সদর দরজায় কলিং বেল টিপলেন নরেন্দ্র ভার্মা। তিন-চারবার বাজাবার পরেও কোনও সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না। সারা বাড়িটা বড় বেশি নিস্তব্ধ।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "বাড়িতে কেউ নেই মনে হচ্ছে।"

কাকাবাবু বললেন, "দোতলায় একটা আলো জ্বলছে।"

দু'জনে মিলে কয়েকবার ডাকলেন, "প্রোফেসর ভার্গব। প্রোফেসর ভার্গব!"

তাও কেউ সাড়া দিল না।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "বোধ হয় ভুল করে একটা ঘরে আলো জ্বেলে চলে গেছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "এত বড় বাড়ি, কোনও দরোয়ান বা ভৃত্য থাকা উচিত ছিল না ? বাড়ি ফেলে সবাই কি চলে যেতে পারে ? দরজার বাইরে তালা নেই, ভেতর থেকে বন্ধ, ওপরে আলো জ্বলছে, কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে।"

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুর চোখের দিকে তাকিয়ে রইলেন। তাঁর মুখে উদ্বেগ ফুটে উঠল।

কাকাবাবু বললেন,

"দেওয়ালে একটা জলের পাইপ রয়েছে, ওটা বেয়ে দোতলার বারান্দায় ওঠা যেতে পারে। কিন্তু আমি খোঁড়া মানুষ, ওই কাজটা তো পারব না ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমি চেষ্টা করতে পারি। কিন্তু অপরিচিত লোকের বাড়িতে এইভাবে ওঠা কি ঠিক হবে ? তার চেয়ে বরং ফিরে গিয়ে থানায় খবর দেওয়া যাক। পুলিশ যা হোক ব্যবস্থা করবে।"

কাকাবাবু বললেন,

"আসবার আগে একটা টেলিফোন করা উচিত ছিল। চলো তো বাড়িটার চারপাশটা একবার ঘুরে দেখা যাক।"

সব দিকেই ফুলের বাগান, নানান রকম ফুলের গাছ। বাগানটার বেশ যত্ন করা হয় বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু এখন ফুল দেখার সময় নেই।

কাকাবাবু ক্রাচ ঠকঠকিয়ে বেশ জোরে-জোরে হেঁটে পৌঁছলেন বাড়িটার পেছন দিকে। সেদিকেও রয়েছে একটা বারান্দা। একটা লোহার ঘোরানো

সিঁড়ি রয়েছে বারান্দা পর্যন্ত।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এই সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে দেখা যেতে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "দাঁড়াও!"

সিঁড়ির নীচে একটা ছোট দরজাও রয়েছে।

কাকাবাবু একটা ক্রাচ তুলে সেই দরজাটা ধাক্কা দিতেই সেটা খুলে গেল। সেটা ভেজানো ছিল।

সেই দরজা দিয়ে দু'জন ঢুকলেন ভেতরে। অন্ধকারে কিছু দেখা যাচ্ছে না। কয়েক পা এগোতেই উঁ-উঁ শব্দ শোনা গেল, মানুষের গোঙানির মতন। দু'জনে থমকে দাঁড়ালেন। দু'জনেই রিভলভার বার করে ফেলেছেন।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"একটা টর্চও আনিনি ছাই। ফিরে গিয়ে দেখব গাড়ির ড্রাইভারের কাছে টর্চ আছে কিনা!"

কাকাবাবু বললেন, "দেওয়ালে হাত বুলিয়ে দেখো তো। আলোর সুইচ থাকতে পারে।"

গোঙানির শব্দটা বেড়ে যাচ্ছে। খানিকটা খোঁজাখুঁজির পরে আলোর সুইচ পেয়ে জ্বালাতেই দেখা গেল, মেঝেতে হাত-পা বাঁধা অবস্থায় একটা লোক পড়ে আছে, তার মুখে কাপড় গোঁজা, তাই সে কথা বলতে পারছে না।

নরেন্দ্র ভার্মা লোকটির মুখ থেকে কাপড়টা টেনে বার করতেই সে ভয়ার্ত গলায় কী যেন বলে উঠল, তেলুগু ভাষা, বোঝবার উপায় নেই।

নরেন্দ্র ভার্মা তাকে আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "পুলিশ, পুলিশ।"

তাকে বন্ধনমুক্ত করতেই সে ছুটে গেল ভেতরের সিঁড়ির দিকে। সিঁড়ির কয়েক ধাপ ওপরে ওইরকম একই অবস্থায় পড়ে আছে আর-একজন লোক। সেও গোঙাচ্ছে। আগের লোকটিই এর বাঁধন খুলে দিল।

সবাই মিলে দোতলায় উঠতে-উঠতে আরও গোঙানির শব্দ শুনতে পেল।

এবারে দেখা গেল একজন মহিলাকে। এরও হাত-পা বাঁধা, মুখে কাপড় গোঁজা।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এ কে ? ভার্গবের স্ত্রী ?"

কাকাবাবু বললেন, "ওকে অন্যরা খুলে দেবে। শিগ্‌গির ভেতরে চলো, প্রফেসর ভার্গবকে আগে খুঁজে বার করা দরকার। ভার্গব আমারই মতন বিয়ে করেননি। একলা থাকেন। এরা সবাই খুব সম্ভবত বাড়ির কাজের লোক।

দোতলায় পরপর কয়েকটি ঘর।

কাকাবাবু দ্রুত এগোতে লাগলেন আলো-জ্বলা ঘরটির দিকে। সে-ঘরের দরজা খোলা।

দরজার সামনে এসেই কাকাবাবু শিউরে উঠে বললেন, "এঃ !"

ঘরের মধ্যে একটা কুকুর মরে পড়ে আছে। বেশ বড় আকারের অ্যালসেশিয়ান, কেউ তাকে গুলি করেছে।

রক্ত থক থক করছে মেঝেতে।

সেটা লাইব্রেরি ঘর, সমস্ত দেওয়াল জুড়ে বইয়ের র‍্যাক।

ছোট-বড় অনেক মূর্তিও সাজানো রয়েছে, কয়েকটা মূর্তি কেউ ছুড়ে ছুড়ে ভেঙেছে।

কিছু বইপত্রও মাটিতে ছড়ানো।

প্রোফেসর ভার্গবকে দেখতে পাওয়া গেল ঘরের এককোণে। একটা রকিং চেয়ারের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা, মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে, শরীরে কোনও স্পন্দন নেই।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"মাই গড ! ডেড ?"

কাকাবাবু দ্রুত এগিয়ে গিয়ে ভার্গবের থুতনিটা ধরে উঁচু করলেন,

তারপর বললেন, "নাঃ, অজ্ঞান হয়ে গেছেন।"

তাঁর বাঁধন খুলে, মুখের কাপড়টা বার করা হল।

কাকাবাবু তাঁর গালে আস্তে-আস্তে চাপড় মেরে ডাকতে লাগলেন, "ভার্গব ! ভার্গব !"

তবুও ভার্গবের জ্ঞান ফিরল না।

নরেন্দ্র ভার্মার নির্দেশে বাড়ির একজন লোক ছুটে এক জাগ জল নিয়ে এল। সেই জলের ছিটে দেওয়া হতে লাগল ওঁর মুখে।

একটু পরে ভার্গব চোখ মেলে বললেন, "কে ? তোমরা আমাকে মারছ কেন ? আমি কী দোষ করেছি ?"

কাকাবাবু মুখটা ঝুঁকিয়ে বললেন, "ভার্গব, আর কোনও ভয় নেই। আমি রাজা রায়চৌধুরী। ভাল করে তাকিয়ে দেখো।"

ভার্গব তবু ফিসফিস করে বললেন, "আমাকে মারতে চাও মারো। কিন্তু আমার মূর্তিগুলো ভেঙো না! ওগুলোর দাম আমার প্রাণের চেয়েও বেশি!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "একটু সময় দাও, রাজা। এরকম অবস্থায় নার্ভাস ব্রেক ডাউন হতে পারে। কথা বলার জন্য জোর কোরো না, নিজে থেকেই ঠিক হয়ে যাবেন।"

সারা ঘরে অনেক ছোট-ছোট টুল রয়েছে, বইয়ের র‍্যাকের ওপরের তাক থেকে বই পাড়ার জন্য। কাকাবাবু একটা টুল টেনে নিয়ে ভার্গবের মুখোমুখি বসলেন। তারপর বললেন, "ওঁকে গরম চা কিংবা কফি খাওয়ানো দরকার। আমারও তখন মুখের চা-টা নষ্ট হয়ে গেছে।"

বাড়ির লোকরা হতভম্বের মতন দাঁড়িয়ে আছে। তাদের দিকে তাকিয়ে কাকাবাবু মুখের কাছে কাপ ধরার ইঙ্গিত করে বললেন, "টি? কফি?"

মহিলাটি ছুটে চলে গেল। বোঝা গেল সে-ই এ বাড়ির রাঁধুনি।

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "পুলিশ কমিশনারকে ফোন করে ব্যাপারটা জানানো দরকার।"

ভার্গব আপন মনে কীসব বিড়বিড় করে বলে চলেছেন, একটু বাদে হঠাৎ যেন তাঁর পুরো জ্ঞান ফিরে এল। তিনি স্পষ্ট চোখ মেলে বললেন, "রাজা রায়চৌধুরী? আমাকে বাঁচাবার জন্য তুমি ঠিক এই সময় কী করে এলে?"

কাকাবাবু বললেন, "কী হয়েছিল কী খুলে বলো তো?"

ভার্গব একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, "কিছুই বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবুর তুলনায় ভার্গবের ছোটখাটো চেহারা। টুকটুকে ফরসা রং, মাথায় টাক, মুখে সাদা দাড়ি। সারাজীবন পড়াশুনো নিয়েই কাটিয়েছেন, কখনও খেলাধুলো করেননি। তাঁর বাবা বেশ ধনী লোক ছিলেন, সেইজন্য টাকা-পয়সা নিয়েও চিন্তা করতে হয়নি কখনও।

পাশের ঘরে একটা কর্ডলেস ফোন খুঁজে পেয়ে সেটাতে কথা বলতে-বলতে নরেন্দ্র ভার্মা ফিরে এলেন এ-ঘরে।

কাকাবাবু বললেন, "ভার্গব, ইনি আমার বিশেষ বন্ধু, নরেন্দ্র ভার্মা, দিল্লি থেকে আজই ছুটে এসেছেন। উনি সি বি আই-এর একজন

হর্তাকর্তা।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “প্রোফেসর ভার্গব, আপনি এতবড় বাড়িতে একা থাকেন ? যে-কোনও দিনই তো চোর-ডাকাতরা হামলা করতে পারে।”

ভার্গব আস্তে-আস্তে বললেন, “একা তো নয়। দরোয়ান আছে, মালি আছে, আর আমার কুকুর টোবি, কোনওদিন কিছু হয়নি, ওঃ ওরা টোবিকে মেরে ফেলল, আমার চোখের সামনে, ওঃ ওঃ।”

ভার্গব কেঁদে ফেললেন।

নরেন্দ্র ভার্মা কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, তাঁকে হাত তুলে চুপ করার ইঙ্গিত করলেন কাকাবাবু।

তিনি জানেন যে, যারা কুকুর পোষে, তাদের প্রিয় কুকুর মারা গেলে তারা কত কষ্ট পায়। ঠিক নিজের ছেলেমেয়ের মৃত্যুর মতন শোক। এ শোকে কোনও সান্ত্বনাও দেওয়া যায় না। কাঁদতে দেওয়াই ভাল।

একটু পরে তিন কাপ কফি এল।

কাকাবাবু বললেন, “ভার্গব, একটু কফি খাও, ভাল লাগবে।”

নরেন্দ্র ভার্মা এবার জিজ্ঞেস করলেন, “আপনাকে যারা বেঁধে রেখে গেছে, তারা কারা ? একজনকেও চিনতে পেরেছেন ?”

ভার্গব দু' দিকে মাথা নেড়ে বললেন, “না। জীবনে দেখিনি। কথা শুনলেই বোঝা যায়, বিশেষ লেখাপড়া জানে না। এই ধরনের লোক তো আমার বাড়িতে আসে না। এখানে ছাত্রছাত্রী বা অধ্যাপক দু'-একজন আসেন। আমি নিরিবিলিতে থাকতে ভালবাসি। তবু কেন এই উপদ্রব ?”

কাকাবাবু বললেন, “যারা এসেছিল তারা সাঙ্ঘাতিক লোক। এ-বাড়ির দরোয়ান, মালি আর রাঁধুনির হাত-পা-মুখ বেঁধে ভেতরে ফেলে রেখে গেছে। ভার্গবেরও একই অবস্থা। আমরা এসে না পড়লে দিনের পর দিন ওরা এই অবস্থায় পড়ে থাকত। সদর দরজা বন্ধ করে পেছনের দরজা দিয়ে চলে গেছে। অন্য লোক ডাকতে এলে হয়তো সদর দরজা বন্ধ দেখে ফিরে যেত।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, “একটা ঘরের আলো জ্বেলে রেখে গেছে।”

ভার্গব বললেন, “ওরা এসেছিল দুপুরে। তবু ইচ্ছে করে আলো জ্বালল।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

"কুকুরটা ছাড়া আর কাউকেই প্রাণে মারেনি। উদ্দেশ্য কী, ডাকাতি? আপনি একটু সুস্থ হয়ে উঠুন। তারপর দেখুন, কী-কী নিয়ে গেছে। পুলিশকে খবর দিয়েছি, কমিশনার সাহেব নিজেই হয়তো কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে পড়বেন।"

ভার্গব বললেন, "কী আর নেবে ডাকাতরা? আমার বাড়িতে সোনাদানা বা ওই ধরনের দামি জিনিস কিছু নেই। টাকা-পয়সা থাকে ব্যাঙ্কে। শুধু এই মূর্তিগুলো আর বই, এগুলোই দামি। ওরা কতকগুলো মূর্তি আছড়ে-আছড়ে ভেঙেছে ইচ্ছে করে, এসব মূর্তির দাম ওরা বোঝে না। আমি কিছু নিতে দেখিনি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ওরা তোমার সঙ্গে কোনও কথা বলেনি?"

ভার্গব বললেন, "হঠাৎ দু'জন লোক এই ঘরে ঢুকে এল। আমি বই পড়ছিলাম। টোবি বসে ছিল আমার পায়ের কাছে। অচেনা লোক দেখে টোবি ডাকতে-ডাকতে ছুটে গেল ওদের দিকে। অমনই একজন গুলি করে টোবিকে মেরে ফেলল। তারপর আমার কাছে এসে আমাকে বেঁধে ফেলতে লাগল, আমি কী করেই বা ওদের বাধা দেব? কোনওদিন কারও গায়ে হাত তুলিনি। ওদের একজন মূর্তি ভাঙতে লাগল, আর-একজন আমার দিকে তাকিয়ে দাঁত কিড়মিড় করে বলল, যদি বাঁচতে চাও তো ব্যাঙ্গালোর চলে যাও। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে।"

নরেন্দ্র ভার্মা অবাক হয়ে বললেন, "ব্যাঙ্গালোর? হঠাৎ ব্যাঙ্গালোর কেন?"

ভার্গব বললেন, "ব্যাঙ্গালোরে আমার পৈতৃক বাড়ি, ওরা সেটা জানে বোধ হয়। আমি আসলে কর্নাটকের লোক, যদিও অন্ধ্রপ্রদেশে আছি অনেক বছর। ওরা আমাকে ভয় দেখিয়ে এখান থেকে তাড়াতে চায়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ননসেন্স! কর্নাটকের লোক অন্ধ্রপ্রদেশে থাকতে পারবে না? আপনার মতন একজন পণ্ডিত মানুষকে পেয়ে এদের ধন্য হয়ে যাওয়ার কথা।"

বাইরে একটা গাড়ি থামার আওয়াজ হল।

নরেন্দ্র ভার্মা জানলা দিয়ে উঁকি মেরে বললেন, "পুলিশ কমিশনার এর মধ্যে এসে গেলেন?"

সিঁড়ি দিয়ে পায়ের আওয়াজ করে উঠে এলেন একজন। সাদা প্যান্ট ও সাদা শার্ট পরা। বেশ সুদর্শন পুরুষ। গোঁফ নেই, দেখলে পুলিশ বলে মনেই হয় না।

ঘরে ঢুকে নমস্কার করে বললেন, "আমার নাম সুধীর রাজমহেন্দ্রী, কমিশনার সাহেব খুব ব্যস্ত আছেন। উনি ওয়্যারলেসে খবর পাঠিয়ে আমাকে আসতে বললেন। আমি ডি আই জি, ক্রাইম।"

নরেন্দ্র ভার্মা নিজের নাম বলে জানালেন, "আমি দিল্লি থেকে এসেছি।"

সুধীর রাজমহেন্দ্রী বললেন, "আমি প্রোফেসর ভার্গবকে চিনি, মানে কাগজে ছবি দেখেছি, ওঁর লেখা বইও পড়েছি। উনি নিশ্চয়ই রাজা রায়চৌধুরী? এ-বাড়িতে ডাকাতি হয়েছে?"

নরেন্দ্র ভার্মা সব ব্যাপারটা সংক্ষেপে জানালেন।

রাজমহেন্দ্রী ভুরু কুঁচকে বললেন, "অন্ধ্রপ্রদেশ থেকে কর্নাটকের মানুষদের তাড়াবার জন্য কোনও দল তৈরি হয়েছে, এমন শুনিনি। খোঁজ নিতে হবে। এ-বাড়ির সামনে দু'জন পুলিশ পোস্টিং করে দিলে আর তারা হামলা করতে সাহস করবে না!"

তারপর কাকাবাবুর দিকে ফিরে বললেন, "আপনার কী ঝঞ্ঝাট হয়েছে, তাও আমি শুনেছি। মনে হচ্ছে আপনার ব্যাপারটা আর প্রোফেসর ভার্গবের ব্যাপারটা দুটো আলাদা দলের কাজ। আপনারটাই বেশি সিরিয়াস।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "আমারও মনে হয়, দুটো আলাদা দলের কাজ।"

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "সবটা আপনাদের বুঝিয়ে বলি। ভাইজাগ এমনিতে শান্তিপূর্ণ শহর। খুনোখুনি বিশেষ হয় না। চোর-ডাকাত যে একেবারে নেই তা নয়, তবে অন্য শহরের চেয়ে কম। বাইরে থেকে বহু লোক এখানে বেড়াতে আসে, কাজে কর্মেও আসে, তাদের কোনও ক্ষতি হয় না। গণ্ডগোল হয় পোর্ট এলাকায়। সব পোর্টেই নানারকম স্মাগলিং চলে, মাঝে-মাঝে কিছু ধরা পড়ে, আবার বেড়ে ওঠে। এই স্মাগলিং চালায় নানান রাজ্যের লোক। অন্ধ্রের লোকই বড় কম। যারা ধরা পড়ে তারা মরাঠি, তামিল, পঞ্জাবি, বাঙালি, এমনকী কিছু-কিছু চিনেও আছে। সুতরাং সেই স্মাগলাররা নিশ্চয়ই প্রোফেসর ভার্গবের মতো নিরীহ লোককে নিয়ে মাথা ঘামাবে না, কর্নাটকের লোককে অন্ধ্রপ্রদেশ ছেড়ে যাওয়ার কথাও বলবে না। কিন্তু রাজা রায়চৌধুরীকে

নিয়ে তাদের চিন্তিত হওয়ার কারণ আছে। আপনি অনেক বড়-বড় ক্রিমিনালকে ঘায়েল করেছেন আমি জানি। একবার আন্দামানের খুব বড় একটা স্মাগলারদের গোটা দলকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাই এখানকার স্মাগলাররা ভাবছে, আপনি ভাইজাগে এসেছেন সেরকমই কোনও উদ্দেশ্য নিয়ে।”

কাকাবাবু বললেন, “সত্যিই কিন্তু আমি সেজন্য আসিনি। আমি থাকি কলকাতায়, এত দূর ভাইজাগ শহরের স্মাগলিং নিয়ে মাথা ঘামাব কেন? কেউ আমাকে এ-কাজের দায়িত্বও দেয়নি। আমি এসেছি প্রোফেসর ভার্গবের মূর্তিগুলো দেখার জন্য। এটা আমার শখ।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

“মুশকিল হচ্ছে কী জানো, রাজা, তুমি নিছক শখের জন্য কোথাও যাবে, এটা কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। তুমি যেখানেই যাও, সেখানকার অপরাধীরা তোমার গতিবিধি নিয়ে চিন্তিত হয়ে পড়ে।”

রাজমহেন্দ্রী প্রত্যেকের মুখের দিকে একবার নজর বুলিয়ে গম্ভীর হয়ে বললেন, “আমরা এখন খুবই সাঙ্ঘাতিক একটা ব্যাপার নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি। আপনারা বিশিষ্ট ব্যক্তি, আপনাদের কাছে বলা যেতে পারে। বন্দরে জাহাজ থেকে নানারকম জিনিসপত্র, যেমন ধরুন ঘড়ি, রেডিয়ো, ভি সি আর, সিগারেট, সোনা এইসব স্মাগলিং হয়। সব বন্দরেই হয়। কিন্তু গোপন রিপোর্ট পাওয়া গেছে যে এখন ভাইজাগ বন্দর দিয়ে প্রচুর অস্ত্রশস্ত্র পাচার হচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। সেগুলো কিনছে ওখানকার তামিল টাইগার বিদ্রোহীরা। আপনারা জানেন, ভারত সরকার ওখানকার বিদ্রোহীদের কোনওরকম অস্ত্র সাহায্য করবে না বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। অথচ স্মাগলাররা অস্ত্র পাচার করছে। এতে দু' দেশের সম্পর্ক খারাপ হয়ে যেতে পারে।”

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন,

“আমরাও এই রিপোর্ট পেয়েছি। দিল্লিতে এই নিয়ে খুব আলোচনা চলছে। প্রধানমন্ত্রীও চিন্তিত।”

রাজমহেন্দ্রী বললেন, “যে-কোনও উপায়েই হোক এই স্মাগলিং বন্ধ করতেই হবে। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে হ্যান্ড গ্রেনেড বা হাত-বোমাই যাচ্ছে বেশি। কোথায় এই বোমাগুলো বানানো হচ্ছে, কোন পথে এই বন্দরে আসছে, তা কিছুতেই ধরা যাচ্ছে না।”

রাজমহেন্দ্রী কাকাবাবুর দিকে জিজ্ঞাসুভাবে চেয়ে রইলেন।

কাকাবাবু বললেন, "এটা গুরুতর ব্যাপার ঠিকই। কিন্তু আপনারা বিশ্বাস করুন, আমি সত্যি কথা বলছি, এই স্মাগলারদের ধরার জন্য দিল্লি থেকে আমার কাছে সাহায্য চাওয়া হয়নি। সেজন্য আমি আসিনি। এরকম কাজের দায়িত্বও আমি নিতে পারব না। আমার পক্ষে সম্ভব নয়। আমার সে-ক্ষমতাও নেই।"

রাজমহেন্দ্রী বললেন,

"তা হলে আমি অনুরোধ করব, মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী, আপনি কিছুদিনের জন্য গা-ঢাকা দিন। আজ দুপুরেই আপনাকে ছুরি মারার চেষ্টা হয়েছে। ওরা আবার আপনার ওপর আক্রমণ করবে। আপনি কি পুলিশ পাহারায় চুপচাপ বসে থাকতে পারবেন ? আপনার কলকাতায় ফিরে যাওয়াই উচিত। আমরা আপনাকে এয়ারপোর্টে পৌঁছে দেব। প্রোফেসর ভার্গবের বাড়ির সামনে দুটি পুলিশ পোস্টিং করিয়ে দিলেই চলবে, ওরা এখানে আর আসতে সাহস করবে না।"

নরেন্দ্র ভার্মা একবার গলাখাঁকারি দিলেন। তাঁর সারা মুখে হাসি ছড়িয়ে গেল।

তিনি বললেন, "মিস্টার রাজমহেন্দ্রী, আপনি যা পরামর্শ দিলেন, তা কি রাজা রায়চৌধুরী লক্ষ্মী ছেলের মতন শুনবেন ? ওঁকে আমি ভাল করেই চিনি। দারুণ একরোখা মানুষ। যারা ওঁকে ষড়যন্ত্র করে জেলে পাঠিয়েছে আর ছুরি মারার চেষ্টা করেছে, তাদের অন্তত একজন না একজনকে কঠিন শাস্তি না দিয়ে উনি এখান থেকে নড়বেন না। হয়তো দেখবেন, কালই উনি একা-একা বন্দর এলাকায় ঘুরে বেড়াচ্ছেন।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, বন্দর এলাকাটা একটু ভাল করে ঘুরে দেখা দরকার। রস হিলের ওপর সুন্দর একটা গির্জা আছে, সেটাও আমার দেখা হয়নি।"

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "পরে আর-একবার এসে দেখবেন। এখানে আর একদিনও থাকা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। হোটেলে যে-কোনও লোক যে-কোনও সময়ে ঢুকে পড়তে পারে।"

কাকাবাবু বললেন, "হোটেল ছেড়ে আমি প্রোফেসর ভার্গবের বাড়িতে এসে থাকলেই তো পারি, এখানে অনেক ঘর আছে। জায়গাটাও সুন্দর।"

ভার্গব বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি এসে থাকুন না। খুব ভাল হয়। দু'জনে অনেক গল্প করা যাবে।"

রাজমহেন্দ্রী খুব জোরে-জোরে মাথা নেড়ে বললেন, "না, না, না, সেটা আরও বিপজ্জনক হবে। আপনি যেখানেই যাবেন, ওরা আপনাকে অনুসরণ করবে। এখানেও ধেয়ে আসবে। দু-একটা পুলিশ থাকলেও ওদের আটকানো যাবে না। ওরা সাঙ্ঘাতিক নিষ্ঠুর। কোটি-কোটি টাকার ব্যাপার, তার জন্য দু-চারটে খুন করতে ওদের একটুও হাত কাঁপবে না। আপনি কি প্রোফেসর ভার্গবকেও বিপদে ফেলতে চান ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, আমি অন্য কাউকে বিপদে ফেলতে চাই না।" তারপর তিনি উঠে দাঁড়িয়ে দেওয়ালের র‍্যাকের কাছে একটা মূর্তির সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ভার্গব, এটা কোথাকার ? আরাকু ভ্যালির ?"

ভার্গব বললেন, "না। আরাকু ভ্যালি থেকে একটাই মোটে মূর্তি এনেছিলাম। ওরা সেটাও ভেঙে ফেলেছে।"

জিভ দিয়ে চুকচুক শব্দ করে কাকাবাবু বললেন, "মানুষ যা গড়তে পারে না, তা ভাঙে কেন ?"

মেঝেতে বসে পড়ে কয়েকটা ভাঙা টুকরো জোড়া দেওয়ার চেষ্টাও করতে লাগলেন।

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "আমাকে এবার বিদায় নিতে হবে। রায়চৌধুরী সাহেব, আজকের রাতটা ভেবেচিন্তে ঠিক করুন আপনি কী করবেন। কাল সকালে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করব। প্রোফেসর ভার্গব, আপনাকে আর কেউ বিরক্ত করবে না। পুলিশ পাহারা দেবে।"

ভার্গব ফ্যাকাসেভাবে বললেন,

"বিরক্ত ? হাত-পা বেঁধে রেখে গেল। এঁরা দু'জন এসে না পড়লে কতদিন থাকতে হত কে জানে। হয়তো মরেই যেতাম !"

রাজমহেন্দ্রী চলে যাওয়ার পর কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "ভার্গব, আরাকু ভ্যালিতে যে মূর্তিগুলো দেখেছেন, তা কতদিনের পুরনো হবে মনে হয় ?"

ভার্গব বললেন, "অন্তত হাজার বছর তো হবেই। গুহার মধ্যে পাহাড়ের গায়ে খোদাই করা। একটা খসে পড়ছিল, আমি শুধু সেটাই নিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন,

"ত্রিপুরার ঊনকোটি পাহাড়ের ওপর খোদাই করা অনেক মূর্তি দেখেছি, অনেকটা সে-ধরনের মনে হচ্ছে।"

ভার্গব বললেন, "ত্রিপুরার উনকোটির কথা আমি জানি। আপনি ঠিকই বলেছেন। তবে এই মূর্তিগুলো বাইরে থেকে দেখা যায় না। গুহার মধ্যে। সেখানে খুব অন্ধকার।"

কাকাবাবু বললেন, "অন্ধকারে অত মূর্তি গড়ল কী করে? সর্বক্ষণ মশাল জ্বেলে রাখতে হয়েছে। ধোঁয়ায় তো দম আটকে যাওয়ার কথা।"

ভার্গব বললেন, "হাওয়া চলাচলের নিশ্চয়ই ব্যবস্থা আছে। জায়গাটা বেশ ঠাণ্ডা।"

নরেন্দ্র ভার্মা বলে উঠলেন, "আরে, আরে, তোমরা যে হঠাৎ মূর্তি আলোচনায় মেতে উঠলে! আমার এখন শহরে ফেরা দরকার।"

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক আছে, চলো, যাওয়া যাক। ভার্গব, আপনার এখানে থাকতে ভয় করবে না তো?"

ভার্গব বললেন, "ভয় তো করবেই। আমি আপনার মতন অত সাহসী নই। বাপরে বাপ, বিকেলে আপনাকে একজন ছুরি মারতে এসেছিল, তারপরেও আপনি হেসে কথা বলছেন? আমার তো এখনও বুক কাঁপছে।"

কাকাবাবু বললেন, "শেক্সপিয়রের হ্যামলেট নাটকের একটা সংলাপ আমার খুব ভাল লাগে। টু বি অর নট টু বি, দ্যাট ইজ দ্য কোয়েশ্চেন!"

ভার্গব অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "হঠাৎ এই কথাটা কেন?"

কাকাবাবু বললেন, "এমনিই। মনে পড়ল।"

সেই বাড়ি থেকে বেরিয়ে দেখলেন, দু'জন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে গেটের কাছে। ওঁদের জন্য গাড়িটা অপেক্ষা করছে, ড্রাইভারের মুখে বিরক্তির ভাব।

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু বললেন, "নরেন্দ্র, তুমি সরষের মধ্যে ভূত কাকে বলে জানো?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "তোমাদের অতশত খুঁটিনাটি বাংলা আমি জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আগেকার দিনে মানুষকে ভূতে ধরলে ওঝা ডাকা হত। সেই ওঝারা মন্ত্র পড়া সরষে ছিটিয়ে-ছিটিয়ে দিলে ভূত পালাত। কিন্তু কোনও ভূত যদি সরষে দানার মধ্যেই ঢুকে বসে থাকে, তা হলে আর তাকে তাড়াবে কী করে?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "হঠাৎ এই ভূতের ধাঁধাটা আমাকে জিজ্ঞেস করলে কেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "চোর, ডাকাত, স্মাগলারদের ধরার জন্য আছে পুলিশবাহিনী। এখন পুলিশের মধ্যেই যদি চোর-ডাকাতরা ঢুকে বসে থাকে, তা হলে তাদের ধরা যাবে কী করে ? স্মাগলারদের ধরার জন্য একটা পুলিশবাহিনী যায়, আর ওই পুলিশের মধ্যে ওদের কোনও চর আগে থেকে খবর দিয়ে দেয়। তারা পালাবার সময় পেয়ে যায়।"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "দুঃখের বিষয়, তুমি যা বললে তা মিথ্যে নয়। বড়-বড় অপরাধীদের ধরা যায় না, তারা টাকা পয়সা দিয়ে পুলিশের কিছু লোককে হাত করে রাখে। তবে, এই রাজমহেন্দ্রী লোকটাকে বেশ সৎ মনে হল।"

কাকাবাবু বললেন, "কিছু-কিছু সৎ অফিসার তো আছে নিশ্চয়ই। না হলে দেশটা আর চলছে কী করে ?"

গাড়িটা টিলা থেকে নামতেই কাকাবাবু মুখটা ঝুঁকিয়ে বললেন,

"ড্রাইভার সাহেব, আমরা যদি আর এক ঘণ্টা এখানে থাকি, আপনার কি খুব অসুবিধে হবে ?"

ড্রাইভারটি সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল,

"না, না। সার, আমার ওপর অর্ডার আছে, আপনারা যতক্ষণ চাইবেন, ততক্ষণ আমায় থাকতে হবে।"

কাকাবাবু নরেন্দ্র ভার্মাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার এখন শহরে কী কাজ আছে ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "কয়েকটা জরুরি টেলিফোন করতে হবে দিল্লিতে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে এক ঘণ্টা বাদে করলেও চলবে। এখন মোটে আটটা বাজে।"

"এখানে তুমি কোথায় যাবে ? চতুর্দিক অন্ধকার।"

"এসোই না আমার সঙ্গে।"

কাকাবাবু গাড়িটা থামাতে বললেন। রাস্তার ধারে ঝাউবন। মাঝখান দিয়ে একটা সরু রাস্তা। আকাশে বেশ জ্যোৎস্না। কাকাবাবু আগে-আগে চললেন।

একটু বাদেই পৌঁছে গেলেন বেলাভূমিতে। সেখানে মানুষজন কেউ

নেই।

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে এলে কেন? কী আছে?"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, সামনে এত বড় একটা জিনিস রয়েছে, তুমি দেখতে পাচ্ছ না?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এত বড় জিনিস? তার মানে সমুদ্র?"

"এখানে সমুদ্রের ধারটা কী সুন্দর! রাত্তিরবেলা সমুদ্র আরও সুন্দর দেখায়। এখানে কিছুক্ষণ না থেকে চলে যাওয়ার কোনও মানে হয়?"

"এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে সমুদ্র দেখব? কেউ যদি আমাদের অনুসরণ করে থাকে, পেছন থেকে যে-কোনও সময় এসে আক্রমণ করতে পারে। তুমি কি পাগল হয়েছ?"

"আঃ নরেন্দ্র, তুমি সবসময় চোর-ডাকাতদের কথা ভাব কেন? এমন সুন্দর জ্যোৎস্না ফুটেছে, আকাশে ঝকঝক করছে কত তারা, কী চমৎকার হাওয়া দিচ্ছে। এই সময়েও ওদের কথা ভাবতে হবে? একটুক্ষণ চুপ করে বসে থাকো। দেখো মনটা কেমন পরিষ্কার হয়ে যাবে।"

তিনি নিজেই আগে বসে পড়লেন বালির ওপর।
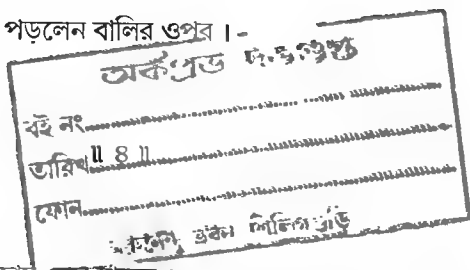
টুং করে একবার শুধু দরজায় বেল বাজল।

সামান্য শব্দেই কাকাবাবুর ঘুম ভেঙে যায়। তিনি বালিশের পাশে রাখা হাতঘড়িটা তুলে দেখলেন পৌনে ছ'টা বাজে।

জানলার পরদা সরানো, বাইরে দেখা যাচ্ছে ভোরের নরম নীল আকাশ।

শুয়ে-শুয়েই কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কে?"

উত্তর এল না, আবার বেল বাজল একবার।

উঠে ড্রেসিং গাউন গায়ে জড়িয়ে, ক্রাচ দুটো না নিয়েই তিনি এক পায়ে লাফাতে-লাফাতে এলেন দরজার কাছে।

ম্যাজিক আই দিয়ে বাইরে দেখার চেষ্টা করলেন। কাউকে দেখা গেল না।

আবার লাফিয়ে-লাফিয়ে ফিরে গিয়ে বালিশের তলা থেকে রিভলভারটা

নিয়ে এসে এক ঝটকায় খুলে ফেললেন দরজা।

আড়াল থেকে সামনে এসে দাঁড়াল একটি কিশোরী মেয়ে। তেরো-চোদ্দো বছর বয়েস হবে। একটা ধপধপে সাদা ফ্রক পরা, ফরসা রং, মুখখানি ভারী সরল আর সুশ্রী, টানা-টানা চোখ। তার হাতে একগুচ্ছ রজনীগন্ধা।

সেই ফুলগুলি কাকাবাবুর পায়ের কাছে রেখে সে প্রণাম করল।

কাকাবাবু মুগ্ধ বিস্ময়ে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কে ?"

মেয়েটি বাংলায় উত্তর দিল, "আমার নাম রাধা।"

তারপর সে ঘরের মধ্যে তাকিয়ে বলল,

"সন্তুদাদা এখনও ওঠেনি ?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু ? তুমি সন্তুকে চেনো নাকি ?"

রাধা ঘাড় হেলিয়ে বলল, "হ্যাঁ, আমি সন্তুদাকে চিনি, আপনাকে চিনি, জোজো-দেবলীনাকে চিনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু এবার আসেনি আমার সঙ্গে। এসো, ভেতরে এসো।"

রাধা একটি চেয়ারে বসে বলল,

"বাঃ, এখান থেকে সমুদ্র দেখা যায় ? আমি কোনওদিন কোনও হোটেলে থাকিনি।"

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন,

"এত সকালে তুমি কোথা থেকে এলে বলো তো ?"

রাধা বলল, "আমি একটা হস্টেলে থাকি। ভোরবেলা আমার সাঁতার শেখার ক্লাশ। আমি তো সাঁতার জানি, তাই রোজ-রোজ ওই ক্লাশে যেতে ইচ্ছে করে না। সেইজন্য আজ পালিয়ে এসেছি।"

কাকাবাবু বললেন, "বাঃ, সেটা বেশ করেছ। দাঁড়াও একটু চায়ের অর্ডার দিচ্ছি, তুমি চা খাও ?"

রাধা দু'দিকে মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু ফোনে চায়ের কথা বলে দিয়ে রাধার সামনে এসে বসলেন।

তারপর জিজ্ঞেস করলেন, "এবারে বলো তো, তুমি সন্তুকে, আমাকে কী করে চিনলে ? সন্তু তো কখনও ভাইজাগে আসেইনি।"

রাধা বলল, "বাঃ, আমরা আগে কলকাতায় থাকতাম না ? সাত আট বছর বয়েস পর্যন্ত ওখানেই ছিলাম। সেখানেই বাংলা শিখেছি। আমরা কিন্তু বাঙালি নই। আমার পুরো নাম রাধা গোমেজ। আমার মাও বাংলা

জানতেন।"

"তোমরা কলকাতায় কোথায় থাকতে ?"

"খিদিরপুর বলে একটা জায়গা আছে না ? সেইখানে। আমার এক মামাতো দাদার সঙ্গে সন্তুদাদা এক ইস্কুলে পড়ত। সন্তুদাদা একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিল সেই দাদার সঙ্গে। সন্তুদাদাকে আমি সেই একবারই মোটে দেখেছি।"

"তুমি আমাকেও তখন দেখেছিলে ?"

"না, আপনাকে কক্ষনও দেখিনি। আপনাকে চিনেছি বই পড়ে। 'সবুজ দ্বীপের রাজা' বইটা কতবার যে পড়েছি তার ঠিক নেই। সন্তুদাদা আর আপনার সব অভিযানের কথা আমি পড়েছি।"

"বেশ। কিন্তু রাধা বলো তো, আমি যে এখানে এই হোটেলে আছি, তা তুমি জানলে কী করে ?"

"আমি এসেছি বলে আপনি রাগ করেছেন, কাকাবাবু ?"

"না, না, মোটেই রাগ করিনি। তোমার মতন এমন একটা ফুটফুটে মেয়েকে দেখলে কি রাগ করা যায় ? তবে অবাক হয়েছি। এই হোটেলে আমার থাকার কথা তোমাকে কে বলল ?"

রাধা একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তার হাসিমাখা ঝলমলে মুখখানা করুণ হয়ে গেল। ছলছল করে উঠল চোখ দুটি।

হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে সে বলল,

"আমার বাবা আপনাকে মেরে ফেলবে !"

কাকাবাবু দারুণ চমকে উঠে বললেন, "অ্যাঁ, কী বললে !"

রাধা আবার বলল, "আমার বাবা গুণ্ডাদের সর্দার। ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সব লোকেরা বাবার অনুচর। তারা বলেছে। আপনাকে মেরে ফেলবে !"

কাকাবাবু এবারে একটু হেসে বললেন, "তুমি বুঝি গল্প বানাতে ভালবাস, রাধা ?"

রাধা চোখ বড়-বড় করে বলল, "না, গল্প নয়, সত্যি, আপনি বিশ্বাস করুন। আমি নিজের কানে শুনেছি, ওরা বলেছে, রাজা রায়চৌধুরীকে সরিয়ে দিতে হবে !"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা কে ? তার নাম কী ?"

রাধা বলল, "পিটার গোমেজ। আগে ভাল ছিল, এখন খারাপ হয়ে গেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সব ব্যাপারটা খুলে বলো তো। তুমি কোথায় ও-কথা শুনলে, কী করে শুনলে ? তুমি তো হস্টেলে থাকো ?"

রাধা বলল, "আমি হস্টেলে থাকি। শনিবার বিকেলে নিজেদের বাড়িতে যাই। ভিমানিপতনম কোথায় জানেন ? অনেকটা দূরে, সেই যেখানে ডাচদের ভাঙা দুর্গ আর লাইট হাউস আছে, সেখানে আমাদের মস্ত বড় বাড়ি। আমার বাবা আগে একটা জাহাজের ক্যাপ্টেন ছিল, তখন আমরা কত ভাল ছিলাম, কত জায়গায় বেড়িয়েছি। তারপর কীজন্য যেন বাবার চাকরি চলে গেল। ছ' মাসের জন্য জেল খেটেছিল। কী জন্য, তা আমি জানি না। সেই সময় আমার মাও মনের দুঃখে মরে গেল।"

কাকাবাবু বললেন, "ইস। কত বছর আগে ?"

রাধা বলল, "ঠিক সাড়ে ছ' বছর। আমার তখন সাত বছর বয়েস। সব মনে আছে। তখন আমরা কলকাতাতেই থাকতাম। জেল থেকে বেরুবার কিছুদিন পর বাবা এখানে চলে এসে মাছের ব্যবসা শুরু করল। তারপরই আমার নতুন মা এল।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবা আবার বিয়ে করেছেন ?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ। এই নতুন মা আসার পরই বাবা একদম বদলে যায়। হঠাৎ খুব বড়লোক হয়ে গেছে। এখন আমাদের তিনখানা গাড়ি। মাছের ব্যবসা নয়, বাবার দলের লোকেরা স্মাগলিং করে, আমি সব জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি কী করে জানলে, সেটা এবার বলো তো !"

রাধা বলল, "আমার আর কোনও ভাইবোন নেই। নতুন মায়েরও ছেলেমেয়ে নেই। বাবা আমাকে খুব ভালবাসে। প্রত্যেক শনিবার গাড়ি পাঠিয়ে আমাকে হস্টেল থেকে বাড়িতে নিয়ে যায়। নতুন মা কিন্তু আমাকে তেমন পছন্দ করে না। তাই বাবার সঙ্গে বেশিক্ষণ কথা বলাও হয় না। আমি খুব বই পড়ি। বই পড়তেই সবচেয়ে ভালবাসি। বাংলা, ইংরিজি, তেলুগু সবরকম বই পড়ি। বই পড়তে-পড়তে অনেক রাত হয়ে যায়। তখন আমি টের পাই, গভীর রাতে চুপিচুপি বাবার কাছে অনেক লোক আসে। আমাদের বাড়ির মাটির নীচে সুড়ঙ্গ আছে। দু'-তিনটে ঘর আছে। ডাচদের আমলের পুরনো বাড়ি সারিয়ে নেওয়া হয়েছে তো, ওদের ওরকম থাকত। আমি এক-একদিন পা টিপে-টিপে গিয়ে দরজায় কান পেতে শুনেছি। সেই দলের মধ্যে আমার নতুন

মাও থাকে। ওরা স্মাগলিংয়ের কথা বলে, মানুষ খুন করার কথা বলে। শুনতে-শুনতে ভয়ে আমার বুক কাঁপে, তবু না গিয়েও পারি না। একদিন ঝাণ্ডু নামে একটা লোক আমাকে দেখে ফেলেছিল। বাবার দলের মধ্যে সে-ই সবচেয়ে নিষ্ঠুর। সে বাবাকে কিছু বলেনি। গত রবিবার সেখানেই আমি শুনলাম, ঝাণ্ডু দাঁত কিড়মিড় করে বলছে, 'পার্ক হোটেলে রাজা রায়চৌধুরী উঠেছে, তাকে সরিয়ে দিতে হবে। ও এখানে এসেছে কেন ?' বাবাও বলল, 'হ্যাঁ, রাজা রায়চৌধুরীকে সরিয়ে দিতে হবে। ও একটা পথের কাঁটা।' কাকাবাবু, সরিয়ে দেওয়া মানে কী ? মেরে ফেলা নয় ?"

কাকাবাবু হালকাভাবে বললেন, "সরিয়ে দিতে চাইলেই কি সরিয়ে দেওয়া যায় ?"

রাধা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে বলল, "ওরা সাঙ্ঘাতিক লোক। আগেও মানুষ মেরেছে। ঘণ্টে নামে অন্য দলের একটা স্মাগলারকে ওরাই খুন করেছে আমি জানি। ওরা যদি আপনাকে মেরে ফেলে আমি কী করে সহ্য করব ? আমি মনে-মনে আপনাকে পুজো করি। সন্তুদাদাকে কত ভালবাসি... ।"

কাকাবাবু ওর মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "এ কী, তুমি কাঁদছ কেন ? চোখ মুছে ফেলো, তোমার ভয় নেই, আমাকে কেউ মারতে পারবে না।"

একটু পরে নিজেকে সামলে নিয়ে রাধা মুখ তুলে বলল, "আপনাকে মারতে পারবে না, তাই না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ। পারবে না।"

রাধা বলল, "তা হলে আপনি আমার বাবাকে মেরে ফেলবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আরে না, না, আমি মারতে যাব কেন ?"

রাধা বলল, "আমি জানি, আপনাকে কেউ হারাতে পারে না। আপনার শত্রুরাই শেষপর্যন্ত হেরে যায়। তারাই মরে যায় কিংবা পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। আমার বাবা খুব বেপরোয়া, ধরা দেবে না, আপনার হাতেই মরবে। বাবা মরে গেলে নতুন মা আমাকে খুব কষ্ট দেবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার বাবাকে আমি কিছুতেই মারব না, এই তোমাকে কথা দিলাম, রাধা।"

রাধা বলল, "আমার ভয় করে, সবসময় ভয় করে। আমার বাবা কেন এইরকম হয়ে গেল ! কাকাবাবু, আপনি আর এখানে থাকবেন না।

কলকাতায় ফিরে যান। এই স্মাগলাররা সাঙ্ঘাতিক লোক। আমি জানি, বাবাদের দল ছাড়াও আর একটা দল আছে। এই দুই দলে খুব রেষারেষি। এরা নিজেদের মধ্যে মারামারি করে। আর এই দুই দলই মনে করে, আপনি তাদের ধরিয়ে দেওয়ার জন্য এখানে এসেছেন। পুলিশ যা পারে না, আপনি তাই পারেন।"

কাকাবাবু বললেন, "কী মুশকিল, সবাই যে কেন এ-কথা ভাবছে! আমি মোটেই সেজন্য আসিনি। স্মাগলার-টাগলারদের নিয়ে আমি মাথা ঘামাই না।

একবার শুধু আন্দামানে একটা ঘটনায় জড়িয়ে পড়েছিলাম, সেটা ওদেরই দোষ!"

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, "কী দুঃখের কথা। তোমার বয়সী একটি মেয়ে এখন পড়াশুনো করবে, গান গাইবে, ছবি আঁকবে, খেলাধুলো করবে। সাঁতার কাটবে, নিজেকে নিয়ে মশগুল হয়ে থাকবে, এইসবই তো স্বাভাবিক। তা নয়, খুন, স্মাগলিং এসব কথা তোমার মুখে শুনতেও খারাপ লাগছে!"

রাধা বলল, "ওই ঝাণ্ডু কী বলে জানেন তো? ও বলে একটু বড় হলে আমাকেও ওদের দলে নিয়ে নেবে, আমার নতুন মায়ের মতন। আমি অবশ্য ঠিক করেছি, ইস্কুলের পড়া শেষ হলেই কলকাতা চলে যাব। ওখানে কলেজে পড়ব।"

কাকাবাবু বললেন, "হ্যাঁ, তুমি কলকাতায় চলে এলে আমরা তোমার দেখাশুনো করব। তুমি একটু বসো তো রাধা, আমি বাথরুমে দাঁতটা মেজে আসি।"

টুথব্রাশে টুথপেস্ট লাগাতে-লাগাতে কাকাবাবু আপন মনে হাসলেন। কী অদ্ভুত যোগাযোগ! তিনি ঠিক করেছিলেন, স্মাগলিং নিয়ে মাথা না ঘামালেও যারা তাঁকে জেলে ভরার ব্যবস্থা করেছিল, আর ছুরি মারার জন্য ঘাতক পাঠিয়েছিল, তাদের পাণ্ডাকে খুঁজে বার করে তিনি শাস্তি দেবেনই। কিন্তু সেই দলের পাণ্ডাকে খুঁজতেই হল না। তার নাম-ধাম সবই জানা গেল। সেই পিটার গোমেজ এই রাধার মতন একটি সরল, সুন্দর মেয়ের বাবা। পিটার গোমেজকে শাস্তি দিলে রাধাও কষ্ট পাবে খুব। বাবার দোষে কি মেয়েকে শাস্তি দেওয়া যায়?

নাঃ, পুলিশ যা পারে করুক, তিনি আর এর মধ্যে থাকবেন না।

বাথরুম থেকে ফিরে এসে দেখলেন, রাধা একটা ইতিহাসের বই পড়ছে মন দিয়ে। বইটা কাকাবাবু সঙ্গে এনেছেন।

কাকাবাবু বললেন, "রাধা, আমি এখান থেকে আজই চলে যাব ঠিক করলাম। তা হলে তোমার বাবার দলের কেউ আমার ধরা-ছোঁয়া পাবে না। আমার দিক থেকেও তোমার বাবার কোনও বিপদ হবে না।"

রাধা হাততালি দিয়ে বলল, "সেই ভাল, সেই ভাল।"

কাকাবাবু বললেন, "এখন তুমি আমার সঙ্গে ব্রেকফাস্ট খাবে। হোটেলে একা-একা খেতে আমার ভাল লাগে না। তারপর আমি তোমাকে হস্টেলে পৌঁছে দেব।"

রাধা বলল, "আমি নিজেই যেতে পারব, পৌঁছে দিতে হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার জন্য আমার চিন্তা হচ্ছে। তুমি যে আমাব সঙ্গে দেখা করতে এসেছ, এটা যদি ওরা টের পেয়ে যায়? রাধা, তুমি খুব সাবধানে থাকবে। হস্টেল থেকে এক পাও বেরোবে না এখন কিছুদিন। মন দিয়ে পড়াশুনো করবে, স্মাগলিং টাগলিং নিয়ে একদম চিন্তা করবে না।"

নীচের রেস্তরাঁয় না গিয়ে কাকাবাবু রুম সার্ভিসে ব্রেকফাস্টের অর্ডার দিলেন।

ফলের রস, কর্ন ফ্লেক্স, টোস্ট, ওমলেট, সসেজ এসে গেল একটু পরেই। রাধা অনেকখানি ভুরু তুলে বলল, "ওমা, এত খাবার?"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি আমার অতিথি, তোমাকে তো খাতির করতেই হবে।"

রাধা বলল, "আমাদের হস্টেলে ভাল খাবার দেয়। কিন্তু আমার খেতেই ইচ্ছে করে না। বাড়ির কথা ভাবলেই আমার মনখারাপ হয়ে যায়।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি শিগ্গিরই বড় হয়ে উঠবে। তখন নিজের ইচ্ছেমতন জীবনটা গড়ে তুলবে।"

ছুরি-কাঁটা হাতে নিয়ে রাধা কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, "আপনার সামনে বসে কোনওদিন খাব, এ-কথা কল্পনাও করিনি। আপনি তো আমার স্বপ্নের মানুষ। আচ্ছা, সন্তুদাদা কেন এল না?"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুর এখন পরীক্ষা চলছে, তাই সঙ্গে আনিনি।

আচ্ছা রাধা, তুমি ছেলেবেলা বাংলা শিখেছিলে, এখনও মনে রেখেছ কী করে ?”

“আমি যে বই পড়ি ! এখানে আমাদের স্কুলে দুটি বাঙালি মেয়ে আছে তাদের সঙ্গে বাংলায় কথা বলি, তাদের কাছ থেকে বই চেয়ে নিই। এই পৃথিবীতে আমার সবচেয়ে ভাল লাগে বই পড়তে। বই আমার একমাত্র বন্ধু।”

“আচ্ছা, তুমি কীরকম বাংলা পড়ো, একটু পরীক্ষা নিই তো ! বলো, এটা কার লেখা ?

আমাদের ছোট নদী চলে আঁকে বাঁকে
বৈশাখ মাসে তার হাঁটু জল থাকে
পার হয়ে যায় গরু, পার হয় গাড়ি....”

“এটা তো কবিতা। আমি কবিতা বেশি পড়িনি।”

“কবিতা না পড়লে কিন্তু কোনও ভাষা ভাল করে শেখাই যায় না। কবিতা পড়লে কল্পনাশক্তি বাড়ে। আচ্ছা, তুমি ‘যখের ধন’ পড়েছ ?”

“হ্যাঁ, হেমেন্দ্রকুমার রায়ের লেখা। কাকাবাবু, আপনি আমাকে বাচ্চা ভাবছেন নাকি ? আমি ওর চেয়ে বড়দের বই পড়েছি।”

“যেমন ?”

“বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ‘আরণ্যক’। খুব চমৎকার। বইটা আমার আছে। শরৎচন্দ্রের ‘শ্রীকান্ত’, ‘রামের সুমতি’, এই তো সেদিন পড়লাম বিমল করের একটা বই, আর মতি নন্দীর ‘কোনি’ কী ভাল লেগেছে !”

খেতে-খেতে গল্প চলতে লাগল, ইংরেজি বইও বেশ কয়েকটা পড়েছে রাধা।

কাকাবাবু ওকে ‘মবি ডিক’-এর গল্পটা শোনালেন।

খাবার শেষ হতে কাকাবাবু বললেন,

“তুমি যেমন বই ভালবাস, আমিও তেমনই ভালবাসি। দেখলে তো, বইয়ের কথা বলার সময় চোর, ডাকাত, খুনিদের কথা আমাদের একবারও মনে পড়েনি !”

উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু বললেন, “চলো, তোমার হস্টেলটা দেখে আসা যাক।”

হোটেলের গেটের কাছেই ট্যাক্সি দাঁড়িয়ে থাকে। সতর্কভাবে চারদিকটা

একবার দেখে নিয়ে কাকাবাবু একটা ট্যাক্সিতে উঠলেন, সেটা চলল সমুদ্রের ধার দিয়ে।

এই বেলাভূমির নাম দেওয়া হয়েছে শ্রীরামকৃষ্ণ বিচ। এখন এখানে অনেক লোকজন। এই বেলাভূমিতে অবশ্য কেউ স্নান করে না, প্রচুর এবড়োখেবড়ো পাথর রয়েছে, জলে নামা বিপজ্জনক।

খানিকদূর যাওয়ার পর ট্যাক্সি ঢুকে গেল শহরের দিকে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি যে এতক্ষণ বাইরে রইলে, তোমায় কেউ কিছু বলবে না ?"

রাধা মুচকি হেসে বলল, "একটু বকুনি দিতে পারে। বেশি না।"

কাকাবাবু বললেন, "আর এরকম বেরিয়ো না। সাবধানে থাকবে।"

হস্টেলটা প্রায় একটা মাঠের মধ্যে। চারদিক ফাঁকা। বাড়িটা দেখলেই বোঝা যায়, বেশ বড়লোকের মেয়েরাই শুধু এখানে থাকতে পারে। গেটের কাছে রয়েছে বন্দুকধারী দরোয়ান।

কাকাবাবু রাধার হাত ছুঁয়ে আবার বললেন, "খুব সাবধানে থাকবে কিন্তু।"

রাধা বলল, "আপনিও তাই থাকবেন।"

ট্যাক্সিটা ঘুরিয়ে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, "সমুদ্রের ধার দিয়েই আবার হোটেলে ফিরে চলো।"

সমুদ্রের দিকে তাকিয়ে থাকতে-থাকতে কাকাবাবুর মনে হল, এই বঙ্গোপসাগরেরই এক প্রান্তে শ্রীলঙ্কা, আগে যে দেশের নাম ছিল সিংহল বা সিলোন। এখন সেখানে সরকারি সৈন্যদের সঙ্গে জঙ্গি তামিলদের মারামারি কাটাকাটি চলছে। ওই জঙ্গিরা এ-দেশের প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীকে অকারণে মেরে ফেলল, তবু একদল লোক ওদের কাছে অস্ত্রশস্ত্র পাঠাচ্ছে। পৃথিবীর যেখানেই যুদ্ধ চলুক, একদল লোক সেখানে অস্ত্র পাঠিয়ে বড়লোক হতে চায়। কত মানুষ যে মরে, তা তারা গ্রাহ্যও করে না!

হোটেলে ফিরে কাকাবাবু লবিতে একটা কাচের ঘরে ঢুকে অধ্যাপক ভার্গবের বাড়িতে ফোন করলেন।

ভার্গব ফোন ধরতে কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কেমন আছেন ? আর কোনও হামলা হয়নি তো ?"

ভার্গবের গলার স্বর খুব মিনমিনে। তিনি ক্লান্তভাবে বললেন,

"না, হামলা হয়নি, পুলিশ পাহারা দিচ্ছে। কিন্তু ওরা আবার ভয় দেখিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাই নাকি ? কী করে ভয় দেখাল ?"

ভার্গব বললেন, "টেলিফোনে। একজন খুব বিশ্রী ভাষায় গালাগালি দিয়ে বলল, 'বাঁচতে চাস তো কর্নাটকে ফিরে যা। এখানে থাকলে পুলিশও তোকে বাঁচাতে পারবে না!' এইরকম ভাষা শুনলেই আমার বুক কাঁপে। ভাবছি, ব্যাঙ্গালোরেই চলে যাব। সেখানে গিয়ে কিছুদিন থাকব।"

কাকাবাবু বললেন, "আর একটা কাজ করা যায়। আমরা আরাকু ভ্যালিতে চলে যেতে পারি। সেখানে তো এসব উপদ্রব থাকবে না। আজই গেলে কেমন হয় ?"

ভার্গব টেনে-টেনে বললেন,

"রায়চৌধুরী, তা বোধ হয় আমি পারব না। মনের জোর পাচ্ছি না। ব্যাঙ্গালোরে চলে যাওয়াই এখন আমার পক্ষে ভাল মনে হয়। প্লেনের টিকিট পেলেই চলে যাব।"

কাকাবাবু একটুক্ষণ চিন্তা করে বললেন, "তা হলে আমি কি একলাই ঘুরে আসতে পারি ? আমিও আর ভাইজাগে থাকতে চাই না। ওখানে ক'টা দিন নিরিবিলিতে কাটাব, গুহার মধ্যে মূর্তিগুলো দেখে আসব।"

ভার্গব বললেন, "তা যেতে পারেন। আপনার কাছে যে ম্যাপটা পাঠিয়েছি, সেটা দেখে আপনার খুঁজে পেতে অসুবিধে হবে না। আমি তো মাস চারেক সেখানে যাইনি, আপনি গিয়ে দেখে আসুন মূর্তিগুলো কী অবস্থায় আছে।"

ফোন রেখে দিয়ে কাকাবাবু তক্ষুনি বেরিয়ে পড়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। নিজের বেশিরভাগ জিনিসপত্র রেখে দিতে বললেন হোটেলের লকারে। একটা ব্যাগে দু'-একটা জামা-প্যান্ট গুছিয়ে নিয়ে যাত্রা শুরু করে দিলেন।

আরাকু ভ্যালিতে সাধারণত সবাই ট্রেনে চেপেই যায়। দু' পাশের দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু কাকাবাবু একটা জিপগাড়ি ভাড়া নিলেন। ওখানকার পাহাড়ি রাস্তায় তিনি বেশি হাঁটাচলা করতে পারবেন না ক্রাচ নিয়ে। গাড়ি লাগবেই।

ড্রাইভারটির নাম সুলেমান খান। এখানকার অধিকাংশ লোক হিন্দি জানে না, ভাঙা-ভাঙা ইংরেজি জানে। যারা ইংরেজিও শেখেনি, তাদের সঙ্গে কথা বলা খুব মুশকিলের ব্যাপার। সুলেমান কিছু-কিছু হিন্দিও বলতে পারে। সুলেমানের বাড়ি অনন্তগিরিতে, সেইজন্য সে এদিককার রাস্তাঘাট ভাল চেনে।

প্রথমদিকে বেশ কিছুটা সমতলের রাস্তা, তারপর পাহাড়ে উঠতে হয়। সুলেমানের সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে কাকাবাবু বই খুলে পড়তে লাগলেন।

পৌঁছতে-পৌঁছতে বিকেল হয়ে গেল। দুপুরে এক জায়গায় থেমে রুটি-মাংস খেয়ে নিয়েছেন দু'জনে। জিপটাও মাঝখানে একবার গণ্ডগোল করেছিল।

আগে থেকেই খবর নিয়েছিলেন যে, এখানে একটা টুরিস্ট গেস্ট হাউস আছে। সেটার নাম 'ময়ূরী'। নামের বাহার থাকলেও সেটার বেশ জরাজীর্ণ অবস্থা। একটা ঘর পাওয়া গেল অবশ্য, দেওয়াল নোনা ধরা, জানলার পরদা ছেঁড়া, বিছানার চাদর নোংরা। কাকাবাবু ওসব গ্রাহ্য করলেন না। যখন যেমন পাওয়া যায়, তেমন জায়গাতেই থাকতে তিনি অভ্যস্ত।

আজ আর কোথাও বেরোবেন না বলে সুলেমানকে তিনি ছুটি দিলেন।

তারপর স্নানটা সেরে গেস্ট হাউসের বাইরে একটা গোল, বাঁধানো চাতালে এসে বসলেন।

সন্ধে হতে একটু বাকি আছে। আকাশ শেষ-সূর্যের আলোয় লাল।

কাকাবাবু ঘাড় ঘুরিয়ে দেখলেন চারদিকটা। সবদিকেই পাহাড়। গোল করে পাহাড় দিয়ে ঘেরা, মাঝখানে এই উপত্যকা। এরকম জায়গা খুব কমই দেখা যায়। বেশ একটা শান্ত সৌন্দর্য আছে। এখনও হোটেল-টোটেল তেমন হয়নি বলে বেশি লোক এখানে আসে না।

দিনের বেলায় যথেষ্ট গরম ছিল, এখন বাতাসে শীত-শীত ভাব। ঘর থেকে একটা চাদর নিয়ে এলে ভাল হয়। কিন্তু কাকাবাবু উঠলেন না। একটু-একটু করে আলো কমে আসছে, দিগন্তের পাহাড়গুলো মিলিয়ে যাচ্ছে, এই দৃশ্যটা তাঁর দেখতে ভাল লাগছে।

হঠাৎ তিন-চারজন লোক সেখানে এসে জোরে-জোরে গল্প শুরু করে দিল।

টুরিস্ট হাউসে সাইকেলে চেপে লোক আসছে। এত লোক এখানে নিশ্চয়ই আসে না। ওরা বোধ হয় এখানে খেতে আসে। কিন্তু মাত্র সাড়ে ছ'টা বাজে, এখনও তো খাওয়ার সময় হয়নি।

এটা বোধ হয় স্থানীয় লোকদের একটা আড্ডাখানা।

অনেক লোকই কাকাবাবুর দিকে ফিরে-ফিরে তাকাচ্ছে। এখানে নিশ্চয়ই তাঁকে কেউ চিনতে পারবে না। তবু তাঁর মতন একজন লম্বা-চওড়া লোক, ক্রাচ নিয়ে হাঁটেন, এতেই লোকে কৌতূহলী হয়।

কাকাবাবু এখানে এসে ম্যানেজারের সঙ্গে দু-একটা কথা বলা ছাড়া আর কারও সঙ্গেই কথা বলেননি।

এক-একদিন তাঁর লোকজনের সঙ্গে কথা বলতে ইচ্ছেই করে না।

বকবক-করা লোকগুলো থেকে খানিকটা সরে গিয়ে কাকাবাবু আর একটা নির্জন জায়গায় বসে রইলেন অনেকক্ষণ। আকাশে তারা ফুটছে একটা-একটা করে। চাঁদও উঁকি মারছে দিগন্তে। এইরকম সময়ে চুপচাপ বসে থাকতেই ভাল লাগে।

রাত দশটা বাজতেই কাকাবাবু সামান্য কিছু খেয়ে নিয়ে দরজা বন্ধ করে দিলেন নিজের ঘরের। শীত বেশ বেড়েছে, এখন আর বাইরে বসা যাবে না।

ঘরের আলোটা টিমটিম করছে, এই আলোতে বই পড়া যাবে না, এখন ঘুমিয়ে পড়া ছাড়া আর কিছু করার নেই।

দরজাটা একবার পরীক্ষা করে নিলেন কাকাবাবু। মোটেই মজবুত নয়। ছিটকিনিটা ঠিকমতো লাগে না। একটিমাত্র জানলারও তারের জাল ছেঁড়া। এখানে আশা করা যায়, কেউ উপদ্রব করতে আসবে না, তবু সাবধানের মার নেই, কাকাবাবু রিভলভারটা রেখে দিলেন বালিশের তলায়।

মাঝরাতেই একবার তাঁর ঘুম ভেঙে গেল।

কারা যেন হইহল্লা করছে পাশের ঘরে। তিনি জোর করে আবার ঘুমোবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু সারারাতই তাঁর ভাল করে ঘুম হল না।

সকালবেলা সুলেমানকে ন'টার মধ্যে গাড়ি নিয়ে চলে আসতে বলেছিলেন, সে আর আসে না। সাড়ে ন'টা, দশটা বেজে গেল, কাকাবাবু অস্থির বোধ করতে লাগলেন। তিনি তৈরি হয়ে বসে আছেন।

এখানকার লোকগুলোর সময়জ্ঞান নেই একেবারে!

সুলেমান শেষপর্যন্ত এল সওয়া এগারোটায়।

তাকে বকুনি দেওয়ার আগেই সে কাঁচুমাচুভাবে জানাল যে, জিপটা কিছুতেই স্টার্ট নিচ্ছিল না। এখানে একটাই মোটে গাড়ি সারাবার জায়গা আছে। সেটা খোলে দশটায়। সেখান থেকে গাড়ি সারিয়ে আনতে দেরি হল।

কাকাবাবু বললেন, "এখন ঠিকঠাক চলবে তো?"

সুলেমান বলল, "হ্যাঁ সার, আর কোনও গোলমাল নেই।"

গাড়িতে উঠে কাকাবাবু বললেন, "বোরা কেভ্স-এ যাব। রাস্তা চেনো তো?"

সুলেমান বলল, "বোরাগুহালু? হ্যাঁ, চিনি। আগে অনেক লোককে নিয়ে গেছি।"

গাড়িটা বড় রাস্তায় পড়ে ডান দিকে কিছুটা এগোতেই আর-একটা জিপগাড়ি খুব জোরে ওভারটেক করে সামনে গিয়ে থেমে পড়ল। সেটা পুলিশের গাড়ি।

সেই গাড়ি থেকে একজন লম্বা লোক নেমে এসে বলল,

"গুড মর্নিং সার। আমি আরাকু থানার ও. সি.। আপনার সঙ্গে আলাপ করতে এলাম।"

কাকাবাবু ভুরু কুঁচকে বললেন, "আমার সঙ্গে? কেন বলুন তো!"

লোকটি একগাল হেসে বলল,

"বাঃ, আপনি বিখ্যাত লোক। আমাদের এলাকায় এসেছেন, আলাপ করব না?"

কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

তারপর বললেন, "আমার কথা কে বলেছে আপনাকে? আপনি আমাকে চিনলেন কী করে?"

লোকটি কাকাবাবুর ক্রাচ দুটির ওপর নজর বুলিয়ে বলল, "আপনাকে দেখলেই চেনা যায়। আপনি টুরিস্ট গেস্ট হাউসে উঠেছেন, সে-খবর পেয়েছি।

"ভাইজাগ থেকে ডি. আই. জি. সাহেব রাজমহেন্দ্রী ফোন করে আপনার কথা জানালেন।"

এবার বোঝা গেল। রাজমহেন্দ্রী নিশ্চয়ই ভার্গবকে ফোন করেছিলেন। ওঁর কাছ থেকেই কাকাবাবুর এখানে আসার কথা জেনেছেন।

ও. সি. বলল, "সার, আমার নাম বিসমিল্লা খান। আপনার এখানে দেখাশুনোর সব ভার আমার ওপর ছেড়ে দিন। যা দরকার হয় আমাকে হুকুম করবেন।"

কাকাবাবু এবার সামান্য হেসে বললেন, "আমি বেড়াতে এসেছি। দেখাশুনো করার তো কিছু দরকার নেই। ঠিক আছে, আপনার সঙ্গে আলাপ হয়ে ভাল লাগল। নমস্কার।"

বিসমিল্লা খান বলল, "আমার কোয়ার্টার কাছেই। একবার আসুন সার, একটু চা খেয়ে যাবেন।"

কাকাবাবু বললেন, "অনেক বেলা হয়ে গেছে, এখন আর চা খাব না। আমি বোরা কেভ্‌স দেখতে যাচ্ছি।"

বিসমিল্লা বলল, "সে তো অনেকক্ষণ খোলা থাকবে। একটু পরে যাবেন। চা না খান, শরবত খাবেন চলুন সার।

"রাজমহেন্দ্রী সাহেব বলে দিয়েছেন, আপনার যত্নের যেন কোনও ত্রুটি না হয়। আপনি সি. বি. আই.-এর বড় অফিসার।"

কাকাবাবু বললেন, "না, না, আমি সি. বি. আই.-এর কেউ না। শুনুন বিসমিল্লা সাহেব, বেশি যত্ন করার দরকার নেই। আমি এখন শরবতও খাব না। বোরা কেভ্‌স ঘুরে আসি। ওবেলা আপনার সঙ্গে দেখা করব।"

বিসমিল্লা খান আরও কিছুক্ষণ ঝুলোঝুলি করল, সময় নষ্ট হল অনেকটা।

গাড়ি আবার স্টার্ট দেওয়ার পর কাকাবাবু সুলেমানকে জিজ্ঞেস করলেন, "এই বিসমিল্লা কি সানাই বাজাতে পারে?"

সুলেমান বুঝতে না পেরে বলল, "না তো! এ-কথা জিজ্ঞেস করলেন কেন সার?"

কাকাবাবু বললেন, "বিসমিল্লা খান নামে ভারতবিখ্যাত একজন সানাইবাদক আছেন, শোনোনি বুঝি?"

সুলেমান বলল, "না সার, শুনিনি। তবে এই ও. সি. সাহেব আপনার সঙ্গে অত হেসে কথা বললেন, কিন্তু এমনিতে খুব কড়া। সবাই ওঁকে ভয় পায়।"

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন, 'ওর ওপরওয়ালা রাজমহেন্দ্রী ভাইজাগ থেকে ফোন করেছে বলেই এত খাতির করছে। না হলে আমাকে পাত্তাই দিত না।'

খানিকটা পরে সুলেমান আবার বলল, "সার, একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? আপনি বোরাগুহালু যাচ্ছেন কেন ? সেখানে তো আপনি গুহার মধ্যে নামতে পারবেন না।"

কাকাবাবু বললেন, "পারব না ?"

সুলেমান বলল, "আপনি খোঁড়া মানুষ। সে-গুহা তো অনেক গভীর, একেবারে পাতালে নেমে গেছে প্রায়। সেখানে নামা আপনার পক্ষে অসম্ভব !"

কাকাবাবু আস্তে-আস্তে মাথা নেড়ে বললেন, "হুঁ, পা-টা খোঁড়া হয়ে গিয়ে ওই তো মুশকিলে পড়েছি। এখন অনেক কিছুই পারি না। তবু চলো, গুহার মুখটা অন্তত দেখে আসি। বেড়াতে এসেছি, আমার তো অন্য কোনও কাজ নেই।"

বোরা কেভ্‌স বা বোরাগুহালু বেশ বিখ্যাত জায়গা। অনেক টুরিস্ট আসে। মূল রাস্তা ছেড়ে আঁকাবাঁকা পাহাড়ি পথ দিয়ে বেশ কিছুটা ভেতরে যেতে হয়।

সেখানে মস্ত বড় একটা গুহামুখ আছে। প্রকৃতির খেয়ালে ভেতরের চুনাপাথরে বৃষ্টির জল চুঁইয়ে-চুঁইয়ে অনেক ভাস্কর্য তৈরি হয়েছে। মনে হয় শিবলিঙ্গ বা নানা ঠাকুর দেবতার মূর্তি। ঠিক যেন মানুষের তৈরি। লোকের ধারণা, রাম, লক্ষ্মণ, সীতাও একসময় থেকে গেছেন এই গুহায়।

দশ টাকার টিকিট কেটে ভেতরে ঢুকতে হয়। লম্বা লাইন পড়েছে। গাড়িটা ছেড়ে দিতে হয়েছে খানিকটা আগে, কাকাবাবু ক্রাচ বগলে নিয়ে হেঁটে-হেঁটে গেটের দিকে এগোতেই কয়েকজন তাঁর দিকে তাকিয়ে হেসে উঠল।

কাকাবাবু মনে-মনে বললেন,

"পঙ্গুও গিরি লঙ্ঘন করতে পারে, তা অনেকে জানে না। ক্রাচ বগলে নিয়ে মাউন্ট এভারেস্টেও ওঠা যায়।"

তিনি গেটের কাছে দাঁড়াতেই টিকিট কাউন্টারের পাশ থেকে একটা লোক এগিয়ে এসে বলল, "সার, আপনাকে তো যেতে দেওয়া হবে না।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন ?"

লোকটি বলল, "আপনি, মানে, আপনি কী করে যাবেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমি খোঁড়া বলে ভাবছ তো ? আমি যদি নিজে ঝুঁকি নিয়ে যেতে চাই, তাতে তোমার কী আপত্তি ? পারব কি না সে আমি নিজেই বুঝব।"

লোকটি বলল, "তবু আপনার কোনও অ্যাক্সিডেন্ট হলে আমরাই দায়ী হব। তাও ভেতরে আলো থাকলে আপনি গাইড নিয়ে যেতে পারতেন। কাল থেকে ইলেকট্রিক লাইন খারাপ হয়ে গেছে, আলো জ্বলছে না।"

কাকাবাবু বললেন, "তার মানে আমি টিকিট কাটতে চাইলেও আপনারা টিকিট দেবেন না ?"

লোকটি বলল, "না, সার। দুঃখিত সার।"

কাকাবাবু আর তর্ক করলেন না। তিনি এই গুহা দেখতেও আসেননি।

তবু তিনি নিরাশ হওয়ার ভান করে বললেন, "ইস, এতদূর থেকে এসেছি, তবু দেখা হবে না ? শুধু-শুধু এত পয়সা খরচ হয়ে গেল।"

ঠুক-ঠুক করে তিনি ফিরে গেলেন গাড়ির কাছে।

সুলেমানকে বললেন, "তুমি ঠিকই বলেছ। আমাকে টিকিট কাটতেই দিল না।"

সুলেমান বলল, "এটা খুব ফেমাস জায়গা সার। অনেক সাহেব-মেম দেখতে আসে। ওয়ার্ল্ডে এত বড় ন্যাচারাল গুহা আর নেই।"

কাকাবাবু মনে-মনে হাসলেন। এরকম গুহা, এর চেয়ে অনেক বড় আর গভীর প্রাকৃতিক গুহা এ-দেশেও আছে, পৃথিবীতে অনেক জায়গায় আছে। আমেরিকায় লুরে ক্যাভার্ন মাটির নীচে এক-দেড় মাইল নেমে গেছে, সেখানেও জল চুঁইয়ে বিস্ময়কর সব জিনিস তৈরি হয়েছে, কাকাবাবু সেসব দেখে এসেছেন। এ-দেশের লোকেরা সবকিছু বড্ড বাড়িয়ে বলে।

জিপে উঠে বললেন, "এদিকে এসেছিই যখন, আশপাশটা একটু ঘুরে দেখে যাই। সামনের ওই পাহাড়টা কচ্ছপের মতন, ওইদিকে চলো তো।"

এই অঞ্চলে ঢেউয়ের মতো অসংখ্য পাহাড় ছড়িয়ে আছে। কোনওটা গাছপালা ঢাকা, কোনওটা একেবারে ন্যাড়া। মাঝখান দিয়ে একটাই পথ, কখনও খুব খাড়াই, কখনও দারুণ ঢালু। সুলেমান খুব ভাল ড্রাইভার, ঠিকমতো চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

কাকাবাবু পেছনের সিটে বসেছেন। ব্যাগ থেকে একটা ম্যাপ বার করে কোলের ওপর রেখেছেন, সুলেমান সেটা দেখতে পাচ্ছে না। কাকাবাবু ম্যাপের সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছেন কোনটা কোন পাহাড়।

এক জায়গায় তিন-চারটে গাছভর্তি গাঢ় হলদে রঙের ফুল ফুটে আছে, কাকাবাবু সেখানে গাড়িটা থামাতে বললেন। নেমে পড়ে তিনি ছিঁড়ে নিলেন একগুচ্ছ ফুল। গন্ধ শুঁকলেন। একটু দূরে ক্যাকটাসের ঝোপ। সেখান

থেকেও ভেঙে নিলেন একটু ক্যাকটাস।

যেন তিনি এইসব দেখার জন্যই এসেছেন। তাঁর অন্য কোনও কাজ নেই।

আবার গাড়িটা খানিকটা চলার পর এক জায়গায় দেখা গেল রাস্তার ওপর বড়-বড় পাথর পড়ে আছে। মনে হয় পাহাড় থেকে ধস নেমেছিল। গাড়ি আর ওদিকে যাবে না।

এদিকে গাড়ি-টাড়ি বিশেষ চলেও না। এ-পর্যন্ত আর একটাও গাড়ি দেখা যায়নি। চারদিকেই শুধু পাহাড় নিস্তব্ধভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

সুলেমান জিজ্ঞেস করল, "গাড়ি ঘুরিয়ে নেব, সার ?"

কাকাবাবু ম্যাপটা গুটিয়ে ফেলে বললেন, "জায়গাটা ভারী সুন্দর। এক্ষুনি ফিরতে ইচ্ছে করছে না। তুমি এখানে অপেক্ষা করো, আমি একটু পায়ে হেঁটে ঘুরে আসি।"

সুলেমান বলল, "আপনার হাঁটতে কষ্ট হবে সার। আমি সঙ্গে আসব ?"

কাকাবাবু বললেন, "না, তার দরকার নেই। আমার অভ্যেস আছে।"

কাকাবাবু পাথরগুলোর পাশ দিয়ে এগিয়ে খানিকটা পরে একটা বাঁক ঘুরে গেলেন। সুলেমানকে আর দেখা গেল না।

কাকাবাবু পকেট থেকে ম্যাপটা বের করে আবার খুললেন।

ম্যাপে এখানকার রাস্তার বাঁকগুলোর এক দুই করে নম্বর দেওয়া আছে। সাত নম্বর বাঁকে একটা তারকা-চিহ্ন।

কাকাবাবু গুনে-গুনে সাত নম্বর বাঁকে এসে থামলেন। এখানে পাহাড়ের পাশ দিয়ে একটা সরু পথ। সেটা ধরে একটুখানি যেতেই চোখে পড়ল, একটা মস্ত বড় বটগাছ, তার পাশেই দৈত্যের মুখের হাঁয়ের মতো একটা গুহা। ওপর থেকে ঠিক যেন দুটো দাঁত বেরিয়ে আছে।

এতটা রাস্তা হেঁটে আসতে কাকাবাবু হাঁফিয়ে পড়েছিলেন, এবার বুক ভরে শ্বাস নিলেন।

এটাই প্রোফেসর ভার্গবের আবিষ্কার করা গুহা। এই গুহার কথা এখনও বিশেষ কেউ জানে না। এই গুহার ভেতরে পাথরের গায়ে খোদাই করা আছে অনেক মূর্তি। প্রকৃতির সৃষ্টি নয়, মানুষের তৈরি। হাজার বছর আগে হিন্দু আর বৌদ্ধদের খুব লড়াই হয়েছিল। অনেক বৌদ্ধ পালিয়ে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছিল এইরকম সব নির্জন গুহায়। সেখানে সময় কাটাবার জন্য ছবি এঁকেছে, মূর্তি গড়েছে।

প্রোফেসর ভার্গব এটা আবিষ্কার করেছেন সম্পূর্ণ নিজের উদ্যোগে। ইংরেজিতে দুটি প্রবন্ধ লিখেছেন। সরকারের কাছে অনুরোধ করেছেন এই গুহাটা সংরক্ষণের জন্য। এর মধ্যে অমূল্য শিল্পসম্পদ রয়েছে। কিন্তু সরকারের এখনও টনক নড়েনি।

কাকাবাবু গুহামুখের দিকে এগিয়ে গেলেন। বটগাছের ডালে সামনের

অনেকটা অংশ ঢাকা। গুহামুখে একটা লোহার গেট, তাতে কাঁটাতার জড়ানো। টিনের বোর্ডে একটা নোটিশ ঝুলছে। তাতে লেখা আছে, 'প্রবেশ নিষেধ'। গুহার মধ্যে ধস নেমেছে। সম্পূর্ণ গুহাটিই বিপজ্জনক।

এবারে কাকাবাবু সত্যি-সত্যিই নিরাশ হলেন। এখান থেকেও ফিরে যেতে হবে ?

ভার্গব এখানে কয়েক মাস আসেননি, গুহাটার এই অবস্থা তিনি জানেন না। সরকার এটা দেখাশুনোর ভার নেয়নি, তা হলে লোহার গেট বসিয়ে নোটিশই বা দিল কে ? হয়তো এখানকার ম্যাজিস্ট্রেট এই ব্যবস্থা নিয়েছেন।

কাকাবাবু কাঁটাতার সরিয়ে লোহার গেটে মুখ চেপে ভেতরটা দেখার চেষ্টা করলেন। একেবারে ঘুরঘুট্টি অন্ধকার। গুহাটা কতদূর চলে গেছে তা বোঝাই যাচ্ছে না। কাকাবাবুর ধারণা ছিল, এই গুহাটা তেমন বড় হবে না, প্রোফেসর ভার্গব অন্তত আট-দশবার এর ভেতরে গেছেন। তবে উনি রোগা-পাতলা ছোট্টখাট্টো মানুষ, ওঁর পক্ষে ওঠানামা করা সহজ।

লোহার গেটে একটা তালা লাগানো আছে। কাকাবাবু হাত দিয়ে দেখলেন, সেটা ভেঙে ফেলা এমন কিছু শক্ত নয়। তাঁর খুব ইচ্ছে হল, ভেতরে ঢুকে খানিকটা অন্তত গিয়ে দেখে আসার। কিন্তু টর্চ আনেননি। আর একজন কেউ সঙ্গে থাকলে ভাল হত।

কাকাবাবুর মনে পড়ে গেল সন্তুর কথা। সন্তু এখন কাছে থাকলে অনেক সুবিধে হত। সন্তু তালা না ভেঙেও গেটটা টপকে গিয়ে ভেতরটা ঘুরে আসতে পারত।

কাকাবাবু ভেবে দেখলেন, তাঁর হাতে অনেক সময় আছে। কাল আবার ফিরে আসা যেতে পারে। বড় একটা টর্চ, খাবারদাবার সঙ্গে রাখতে হবে, আর থানার ও. সি.-র কাছে চাইতে হবে একজন বিশ্বাসী শক্ত-সমর্থ লোক।

আজ দুপুর আড়াইটে বেজে গেছে, খিদেও পেয়েছে, আজ ফিরে যাওয়াই ভাল।

কাকাবাবু আবার ফেরার পথ ধরলেন।

গাড়ির কাছে এসে দেখলেন, সুলেমান এঞ্জিনের ডালা খুলে ফেলে কীসব খুটখাট করছে।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল সুলেমান ?"

সুলেমান বলল, "গাড়িটার মুখ ঘুরিয়ে রাখতে গিয়েছিলাম, হঠাৎ স্টার্ট বন্ধ হয়ে গেল। এক্ষুনি ঠিক হয়ে যাবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাড়াতাড়ি করো। বেলা হয়ে গেছে অনেক। তোমার খিদে পায়নি ?"

সুলেমান খুটখাট, ঘটাংঘট করেই চলল। এক-একবার স্টার্ট দেওয়ার চেষ্টা করে। প্রথম-প্রথম ঝ্যান-ঝ্যান শব্দ হচ্ছিল, তারপর আর কোনও শব্দই হয়

না।

কাকাবাবু বসে রইলেন একটা ছাতিম গাছের ছায়ায়। বেশ বিরক্ত লাগছে তাঁর। কাল থেকেই গাড়িটা গড়বড় করছে। ভাড়ার গাড়ি এরকম খারাপ অবস্থায় থাকবে কেন ? পাহাড়ের দেশে ঘোরাঘুরি করতে হবে, তিনি তো বলেই রেখেছেন আগে। পয়সা নেবে অনেক।

বেশ কিছুক্ষণ কেটে যাওয়ার পর কাকাবাবু বললেন, "আমি ঠেলে দিলে কিছু লাভ হবে ?"

অপরাধীর মতো মুখ করে সুলেমান বলল, "যদি সার দয়া করে একবার ঠেলে দেন। আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।"

সুলেমান স্টিয়ারিংয়ে বসল, কাকাবাবু ঠেলতে লাগলেন। খোঁড়া পা নিয়ে গাড়ি ঠেলা কি সহজ কথা ! তবু তিনি ঠেলতে লাগলেন, গাড়ি গড়াতে লাগল, তিন-চারবার এদিক-ওদিক করেও এঞ্জিনে কোনও শব্দই হল না। সারা মুখ ঘামে ভরে গেল কাকাবাবুর।

নেমে পড়ে সুলেমান বলল, "নাঃ, এতে হবে না। টাই রড কেটে গেছে, এ.সি. পাম্প কাজ করছে না, একটা প্লাগ খারাপ হয়ে গেছে... । এইসব পার্টস কিনে একজন মেকানিক ডেকে আনতে হবে।"

কাকাবাবু বললেন, "তাতে কতক্ষণ লাগবে ? তুমি যাবে কী করে ?"

সুলেমান বলল, "আমি দৌড়ে চলে যাব। বোরাগুহালুর কাছে কয়েকটা গাড়ি আছে। ওর কোনও একটা গাড়িতে লিফ্‌ট নিয়ে মেইন রোড চলে যাব, তারপর যেখানে মেকানিক পাই।"

কাকাবাবু বললেন, "এদিকে যে প্রায় বিকেল হয়ে গেল !"

সুলেমান বলল, "আর তো কোনও উপায় নেই সার। এই পাহাড়ি রাস্তায় তো গাড়ি ঠেলেও নিয়ে যাওয়া যাবে না বেশিদূর। খাড়াই পথে উঠবে না। এর পর বোরাগুহালুও বন্ধ হয়ে যাবে। আমি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব আসব সার, আপনি এখানে অপেক্ষা করুন।"

সুলেমান এক দৌড় লাগাল।

কাকাবাবু বিরক্তি চেপে রাখলেন। গাড়ি ঠিক না হলে তো তাঁর ফেরার উপায় নেই। যে রাস্তা দিয়ে বাস যায়, সেই বড় রাস্তা থেকে প্রায় কুড়ি-একুশ কিলোমিটার ভেতরে চলে এসেছেন। পুরোটাই পাহাড়ি চড়াই-উতরাই। ক্রাচ বগলে নিয়ে এতখানি রাস্তা কি হাঁটা যায় ?

আর একটাও গাড়ি এ পর্যন্ত আসেনি, কোনও সাহায্য পাওয়ারও আশা নেই।

সুলেমান কতক্ষণে ফিরতে পারবে কে জানে ? এখানে সে গাড়ির পার্টস বা মেকানিক কোথায় পাবে ? সন্ধে হয়ে গেলে এখানে ফিরে আসবেই বা কী করে ?

পাহাড়ে সন্ধে হয় বেশ তাড়াতাড়ি। বিকেল শেষ হতে না হতেই সূর্য চলে গেছে পশ্চিমের একটা পাহাড়ের আড়ালে। কিছু পাখির ডাক ছাড়া আর কোনও শব্দ শোনা যায় না। দুপুরে কিছুই খাওয়া হয়নি। পাউরুটি, জ্যাম, জেলি আর বিস্কুট সঙ্গে রাখা উচিত ছিল।

যদি পেটে খিদে না থাকত আর সঙ্গে আর দু-একজন থাকত, তা হলে এখানকার এই দৃশ্যটা এই সময় বেশ উপভোগ করা যেত। ঠিক যেন ছায়ার ডানা মেলে নেমে আসছে রাত্রি।

আজ আকাশে পাতলা-পাতলা মেঘ, তারা ফোটেনি, তবে একটু-একটু জ্যোৎস্না আছে। একেবারে মিশমিশে অন্ধকার নয়। এইরকম আবছায়ার মধ্যে সবকিছুরই চেহারা বদলে যায়। একটা পাথরের স্তূপকে মনে হচ্ছে একটা হাতি। বুনো ঝোপের দিকে তাকালে মনে হয় একদল মানুষ উবু হয়ে বসে আছে।

এই পাহাড়ি জঙ্গলে হিংস্র জানোয়ার কিছু আছে কি না কে জানে! ভালুক থাকতে পারে। প্রোফেসর ভার্গব একবার একটা ভালুক দেখার কথা বলেছিলেন। বড়-বড় সাপ তো আছেই। কাকাবাবুর অবশ্য জন্তু-জানোয়ারের ভয় নেই। একবার তাঁর পায়ের ওপর দিয়ে একটা সাপ চলে গিয়েছিল, তিনি নিঃসাড় হয়ে বসে ছিলেন, সাপটা কামড়ায়নি।

সন্ধের পরেই এখানে বেশ শীত লাগে। কাকাবাবু আজ কোট পরে এসেছেন। অস্থিরভাবে কিছুক্ষণ পায়চারি করলেন, তারপর দাঁড়ালেন গাড়িতে হেলান দিয়ে।

ক্রমশ সাতটা বাজল, আটটা বাজল। কাকাবাবুর দৃঢ় ধারণা হল, আজ রাতের মধ্যে সুলেমান আর ফিরতে পারবে না। কাকাবাবুকে এখানেই রাতটা কাটাতে হবে।

সুলেমান কি ইচ্ছে করে তাঁকে এখানে রেখে পালাল? তাতে তার লাভ কী? সে কিছু টাকা নিয়েছে, কিছু টাকা এখনও বাকি আছে। গাড়িটাও রয়েছে এখানে। কাকাবাবু যখন গুহাটা দেখতে গিয়েছিলেন, তখনই তো সে পালাতে পারত। না, সেরকম কোনও মতলব ওর নেই। গাড়িটাই বাজে।

কাকাবাবু যখন বুঝতে পারলেন যে, সুলেমানের আর ফেরার আশা নেই, রাত্তিরে কোনও খাবারও জুটবে না, তখন তিনি ঠিক করলেন যে গাড়িতেই শুয়ে থাকা ভাল।

পেছনের সিটে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে তিনি সবেমাত্র আরাম করছেন, এমন সময় দূরে একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল।

কাকাবাবুর মনটা আনন্দে ভরে গেল। সুলেমান তা হলে ফিরেছে! আর একটা গাড়ি জোগাড় করে এনেছে। ওর চেষ্টার কোনও ত্রুটি নেই। তা হলে ও-গাড়িতেই ফেরা যাবে।

তবু কাকাবাবুর সন্দেহপ্রবণ মন। তিনি তাড়াতাড়ি জিপ থেকে নেমে বেশ খানিকটা দূরে গিয়ে একটা ঝোপের আড়ালে বসে রইলেন। হাতে রিভলভার।

পাহাড় দিয়ে এঁকেবেঁকে আসছে একটা গাড়ি, দেখা যাচ্ছে হেড লাইটের আলো। কাছে আসতে বোঝা গেল, সেটা একটা জোংগা জিপ। থামতেই তার থেকে লাফিয়ে নেমে পড়ল ছ'-সাতজন লোক। ছুটে গেল জিপটার দিকে। ভেতরে ঢুকে, চারপাশ ঘুরে, এমনকী তলাতেও উঁকি মেরে দেখল। তারপর জোরে-জোরে কথা বলতে লাগল নিজেদের মধ্যে। ভাষাটা ইংরেজি নয় বলে কাকাবাবু একটা শব্দও বুঝতে পারলেন না।

তবে, এটুকু বুঝলেন যে, এদের মধ্যে সুলেমান নেই, এরা খালি জিপটা দেখে অবাক হয়েছে। এরা কারা ? সকলেই প্যান্ট-শার্ট পরা, কারও মুখই দেখা যাচ্ছে না ভাল করে।

এবার সবাই সামনের দিকে ছুটল। কাকাবাবু আড়ালে থেকে তাদের অনুসরণ করতে লাগলেন। ওরা গুহাটার দিকেই যাচ্ছে। একজন চাবি দিয়ে খুলে ফেলল লোহার গেটের তালা। জ্বলে উঠল চার-পাঁচটা টর্চ, ওরা ধুপধাপ করে ঢুকে পড়ল গুহার মধ্যে।

খানিকটা দূরে দাঁড়িয়ে কাকাবাবু ভাবলেন, ওদের ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে ওরা এই গুহার মধ্যে আগেও অনেকবার গেছে। ভেতরটা চেনা। গেটের চাবিও আছে ওদের কাছে। গুহার মধ্যে এত অন্ধকার যে রাত আর দিন সমান। তবু রাত্তিরবেলা ওরা গুহার মধ্যে যায় কেন ?

জিপটা খারাপ না হলে কাকাবাবু এখন এখানে থাকতেন না, ওদের দেখতেও পেতেন না।

তিনি বটগাছটার আড়ালে ঠায় দাঁড়িয়ে রইলেন। জিপটার কাছে ফিরে যাওয়া চলে না। লোকগুলো যে-কোনও সময় বেরিয়ে এসে আবার হয়তো জিপটা তল্লাশ করবে। লুকিয়ে থাকা ছাড়া উপায় নেই।

ঘণ্টাখানেক পরে গুহার মধ্যে গুম গুম করে দু'বার শব্দ হল। অনেকটা ভেতরে। গুলির শব্দ নয়, মনে হয় যেন বিস্ফোরণ। ডিনামাইট ফাটানো হচ্ছে ?

কাকাবাবু ভুরু কোঁচকালেন। ডিনামাইট ফাটাচ্ছে কেন ? এরা মূর্তি চোর ? মূর্তি চুরি খুব লাভজনক ব্যাপার। বিদেশে পাচার করলে অনেক টাকাপয়সা পাওয়া যায়। কিন্তু প্রোফেসর ভার্গব বলেছেন, এখানকার মূর্তিগুলো ভুবনেশ্বর-কোনারকের মন্দিরের মতন আলগা-আলগা নয়। পাথরের দেওয়ালে খোদাই করা। খুলে নিতে গেলে ভেঙে নষ্ট হয়ে যাবে। তবু এরা ভাঙছে কেন ?

আর একবার বিস্ফোরণের শব্দ হতেই কাকাবাবু আর কৌতূহল সামলাতে

পারলেন না। সব লোক ভেতরে চলে গেছে, বাইরে কেউ নেই। গুহার মুখটায় গিয়ে একবার ভেতরে উঁকি মেরে দেখার দারুণ ইচ্ছে হল তাঁর।

লোহার গেটটা খোলা। কাকাবাবু মাঝখানে গিয়ে দাঁড়াতেই পেছন থেকে কেউ এসে খুব ভারী কোনও জিনিস দিয়ে জোরে মারল তাঁর মাথায়। তিনি মুখ ঘোরাবারও সময় পেলেন না। 'আঁক' করে একটা শব্দ করে তিনি মুখ থুবড়ে পড়ে গেলেন মাটিতে।

কালো প্যান্ট-শার্ট পরা একজন লোক কাকাবাবুর পা ধরে ছ্যাঁচড়াতে-ছ্যাঁচড়াতে টেনে নিয়ে গেল গুহার মধ্যে।

কতক্ষণ পরে কাকাবাবুর জ্ঞান ফিরে এল, তিনি জানেন না। মাথার পেছনে দারুণ ব্যথা। আবছা-আবছাভাবে টের পেলেন যে তিনি শুয়ে আছেন একটা চলন্ত গাড়িতে।

তিনি ভাবলেন, সুলেমানের জিপ ঠিক হয়ে গেছে, তিনি সেই জিপে ফিরে যাচ্ছেন গেস্ট হাউসে।

তারপরেই মনে পড়ল, মূর্তি-গুহার সামনে কেউ তাঁকে মেরে অজ্ঞান করে দিয়েছে।

তিনি ধড়মড় করে উঠে বসলেন। সত্যিই তিনি শুয়ে ছিলেন একটা জিপের পেছন দিকে। সেটা চলছেও বটে, তবে সেটা সুলেমানের জিপ নয়। তাঁর সামনেই লোহার ডান্ডা হাতে নিয়ে বসে আছে একজন লোক।

কাকাবাবু একবার মাথায় হাত বুলিয়ে নিয়ে সামনের লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমায় কে মেরেছে, তুমি ?"

লোকটি কাকাবাবুর প্রশ্ন গ্রাহ্য না করে সামনের ড্রাইভারদের উদ্দেশে বলল, "মঞ্চাম্মা, এ লোকটা জেগে উঠেছে। আর বেশিদূর নিয়ে গিয়ে কী হবে, এখানেই শেষ করে দিই ? এখান থেকে কেউ লাশ খুঁজে পাবে না।"

কাকাবাবু আবার জিজ্ঞেস করলেন, "বলো না, আমার মাথায় কে মেরেছে, তুমি ?"

লোকটি এবার বিকট মুখভঙ্গি করে বলল, "হ্যাঁ, মেরেছি। আবার মারব।"

কাকাবাবু এত তাড়াতাড়ি আর এত জোরে একটা ঘুসি চালালেন যে, সে বাধা দেওয়ার সময়ই পেল না। পড়ে গেল হাত-পা ছড়িয়ে।

কাকাবাবু বললেন, "অন্যকে মারো। নিজে মার খেতে কেমন লাগে, এবার দেখো।"

লোকটা আবার আস্তে-আস্তে উঠে বসল। লোহার ডান্ডাটা তুলে নিল। কাকাবাবু সেটা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টা করলেন না।

লোকটিব চোখের দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে বললেন, "লোহার ডান্ডা দিয়ে মারবে ? মারো। আমার এই হাত দুটোও লোহার তৈরি।"

লোকটি ডান্ডা চালাতেই কাকাবাবু খপ করে সেটাকে এক হাতে ধরে

ফেললেন। অন্য হাতে লোকটির থুতনিতে আবার এমন ঘুসি চালালেন যে, সে নিজেকে সামলাতে পারল না, তার মাথাটা ঝুঁকে গেল জিপের বাইরে। কাকাবাবু তাকে ধরবার চেষ্টা করলেন, তার আগেই সে পড়ে গেল রাস্তায়।

গাড়িটা ঘচাং করে ব্রেক কষল।

কাকাবাবু আগেই এক নজর দেখে নিয়েছিলেন যে, গাড়িতে ড্রাইভার ছাড়া আর কেউ নেই। তিনি ড্রাইভারের দিকে ফিরতেই সেও মুখ ফিরিয়ে একটা রিভলভার উঁচিয়ে বলল, "মাথার ওপর হাত তোলো, একটু নড়লেই গুলি চালাব।"

কাকাবাবু খুব অবাক হয়ে বললেন, "স্ত্রীলোক?"

ড্রাইভারটি প্যান্ট-শার্ট ও মাথায় একটা টুপি পরা। কিন্তু গলার আওয়াজ শুনলেই বোঝা যায়।

কাকাবাবু বললেন, "আমি কোনও স্ত্রীলোকের গায়ে হাত তুলি না। তোমরা আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিলে?"

মহিলাটি ধমক দিয়ে বলল, "দু' হাত উঁচু করো। গাড়ি থেকে নামো। আমি ঠিক পাঁচ গুনব, তার মধ্যে না নামলে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

কাকাবাবু বললেন, "মাথার খুলি উড়ে গেলে খুব বিচ্ছিরি ব্যাপার হবে। গাড়ির মধ্যে রক্ত, ঘিটু-টিলু ছড়িয়ে পড়বে। ঠিক আছে, আমি নামছি।"

কাকাবাবু ক্রাচ দুটো খুঁজে পেলেন না। এমনিই নামলেন। মহিলাটি এরই মধ্যে দৌড়ে গাড়ির পেছনদিকে চলে এসেছে। রিভলভারটা স্থির রেখে হুকুম করল, "রাস্তার একেবারে ধারে চলে যাও। আগে তোমাকে খতম করিনি, লাশটা সেখানে ফেলতে চাইনি। এখানে তোমাকে মেরে ফেলে দিলে সাতদিনের মধ্যেও তোমার লাশ কেউ খুঁজে পাবে না। তার আগেই শকুনে খেয়ে ফেলবে।"

কাকাবাবু শরীরে একটা ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "ইস ছি ছি, শকুনে খাবে? ভাবতেই কেমন লাগে। তুমি সত্যি-সত্যি গুলি করবে নাকি? ও রিভলভারটা কার? আমারই মনে হচ্ছে। আমাকে ফেরত দেওয়া উচিত।"

মহিলাটি দাঁতে দাঁত চেপে বলল, "খাদের ধারে যাও, এক...দুই..."

কাকাবাবু বললেন, "আমাকে মারবে কেন, আমি কী দোষ করেছি, সেটাও জানতে পারব না?"

অন্য লোকটি একটু দূরে রাস্তার ওপর পড়ে আছে। সে একটা গোঙানির শব্দ করে উঠল।

মহিলাটি সেদিকে মুখ ঘুরিয়ে তীব্র গলায় ডাকল, "এই ইগলু, উঠে আয়, অপদার্থ কোথাকার!"

লোকটি জড়ানো গলায় বলল, "মঞ্চাম্মা, হাঁটুতে খুব চোট লেগেছে!"

মহিলাটি বিরক্তভাবে বলল, "তোকে আমি ঘাড়ে করে গাড়িতে তুলব নাকি ?"

তারপর সে রিভলভার নাচিয়ে কাকাবাবুকে বলল, "ওকে তুলে নিয়ে এসো। গাড়িতে রাখো।"

কাকাবাবু হেসে বললেন, "মারবার আগে আমাকে দিয়ে খাটিয়ে নিতে চাও।"

খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে গিয়ে তিনি লোকটিকে পাঁজাকোলা করে তুললেন। সে ফুঃ ফুঃ করল, আর তার মুখ থেকে রক্ত আর ভাঙা দাঁত বেরিয়ে এল কয়েকটা।

ওকে নিয়ে ফিরে আসার পর কাকাবাবু গাড়িটার কাছে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মহিলাটি হুকুমের সুরে বলল, "ওকে গাড়িতে বসিয়ে দাও !"

কাকাবাবু সে হুকুম না শুনে লোকটিকে উঁচু করে তুললেন নিজের বুকের কাছে।

তারপর বললেন, "মেয়ে হয়ে তুমি খুনি-গুন্ডাদের দলে ভিড়েছ। শুধু ভিড়লেই কী হয়, আগে সব শিখতে হয়। হাতে রিভলভার থাকলেই কি গুলি চালানো যায় ? এখন তুমি কোথায় গুলি করবে ? আগে এই লোকটাকে মারতে হবে। পারবে ?"

কাকাবাবু লোকটাকে ঢালের মতন ধরে রেখে এক-পা এক-পা করে এগোতে লাগলেন।

মহিলাটির মুখখানা ফ্যাকাসে হয়ে গেছে। তবু সে চেঁচিয়ে বলল, "মাথায় গুলি করব, পায়ে গুলি করব।"

কাকাবাবু এবার গর্জন করে উঠলেন, "চালাও গুলি, চালাও ! দেখি কেমন পারো।"

মহিলাটিও একটু-একটু পিছিয়ে যাচ্ছে। একবার তাকিয়ে দেখল, পেছনে খাদ। সে আর যেতে পারবে না। সে থামতেই কাকাবাবু 'এই নাও' বলে লোকটিকে ছুড়ে মারলেন মহিলাটির গায়ের ওপর।

দু'জনেই হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল মাটিতে।

কাকাবাবু ক্ষিপ্রভাবে গিয়ে মহিলাটির হাত থেকে রিভলভারটি কেড়ে নিলেন। সেটার ডগায় ফুঁ দিতে-দিতে বললেন, "হুঁ, যা ভেবেছিলাম, এটা আমারই। কতবার কত লোক কেড়ে নিয়েছে, আবার আমার হাতে ফিরে এসেছে। এবার উঠে দাঁড়াও।"

মহিলাটি আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। ভয়ে তার মুখ রক্তশূন্য হয়ে গেছে একেবারে।

কাকাবাবু বললেন, "এবারে বলো তো, আমার ওপর তোমাদের এত রাগ কেন ? আমি তোমাদের চিনি না, কোনও ক্ষতিও করিনি !"

মেয়েটি কোনও উত্তর দিল না।

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের মতলব কী ? গুহার মধ্যে ঢুকে মূর্তিগুলো নষ্ট করছিলে কেন ?"

মেয়েটি এবারেও চুপ।

কাকাবাবু বললেন, "আমি মেয়েদের গায়ে হাত দিই না। তোমাকে ধরে টানাটানি করতে পারব না। গাড়িতে ওঠো, থানায় গিয়ে যা বলবার বলবে।"

অন্য লোকটি গড়িয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে গেছে। খাদটি অবশ্য খাড়াই নয়, ঢালু। সে আটকে আছে এক জায়গায়। কাকাবাবু উঁকি দিয়ে একবার তাকে দেখে নিয়ে বললেন, "ও থাক। ওকে তুলতে পারব না। তুমি ওঠো গাড়িতে।"

মহিলাটি তবু নড়ল না একটুও।

কাকাবাবু বললেন, "তোমাকে আমি প্রাণে মারব না। কিন্তু পায়ে গুলি চালিয়ে আমার মতন খোঁড়া করে দিতে পারি। দেখবে ? মানুষের বুকে গুলি চালানো যায়, কিন্তু পায়ে মারা খুব শক্ত। পুলিশদের বলা থাকে, চোর-ডাকাতদের বা মিছিলের লোকদের শুধু পায়ে গুলি চালাতে। কিন্তু তারা ফসকে বুকে গুলি করে কত মানুষ মেরে ফেলে ! আমার টিপ দেখো।"

কাকাবাবু ট্রিগার টিপলেন। মহিলাটির ডান পায়ের ঠিক আধ ইঞ্চি পাশ দিয়ে একটা ঝোপ উড়িয়ে দিয়ে গুলিটা বেরিয়ে গেল। প্রচণ্ড শব্দ হল পাহাড়ে-পাহাড়ে।

মহিলাটি লাফিয়ে উঠল, মুখ দিয়ে একটা ভয়ের আর্তনাদ বের হল।

পাশের খাদ থেকে লোকটি চেঁচিয়ে বলল, "মঞ্চাম্মা, জাম্প, জাম্প, জাম্প, ধরা দিয়ো না !"

মহিলাটি ঝাঁপ দিল খাদে। দু'জনেই গড়িয়ে-গড়িয়ে নামতে লাগল নীচে। কাকাবাবু ইচ্ছে করলেই ওদের গুলি করতে পারেন, কিন্তু গুলি করে মানুষ মারার প্রবৃত্তি তাঁর কখনও হয়নি।

কাঁধ ঝাঁকিয়ে আপনমনে বললেন, "পালাল ? কী আর করা যাবে !"

গাড়িটার হেডলাইট জ্বলছে। ধক-ধক করছে এঞ্জিন। কাকাবাবু গাড়ি চালাতে ভালই জানতেন একসময়, অনেকদিন চালাননি। খোঁড়া পা-টা দিয়ে ক্লাচ চাপতে খানিকটা অসুবিধে হয়।

কিন্তু এখানে থাকার তো মানে হয় না। ওরা দু'জনে গড়িয়ে নেমে গেল, কাছাকাছি যদি ওদের কোনও আস্তানা থাকে, তা হলে দলবল নিয়ে আবার ফিরে আসতে পারে।

কাকাবাবু ড্রাইভারের সিটে বসলেন।

চাঁদ পাতলা মেঘে ঢেকে গেছে, জ্যোৎস্না এখন খুব অস্পষ্ট। এ-জায়গাটা কোথায় কাকাবাবু জানেন না, সামনের দিকে না পেছনের দিকে গেলে আরাকু ভ্যালি পৌঁছবেন, সে সম্পর্কেও কোনও ধারণা নেই। পাহাড়ের রাস্তায় ঘন-ঘন

বাঁক। আগে থেকে না জানলে বা একটু অসাবধান হলে গাড়ি পড়ে যায় খাদে। রাস্তাও ভাল দেখা যাচ্ছে না।

কিন্তু উপায় তো নেই, এই জায়গাটা ছেড়ে তাড়াতাড়ি চলে যাওয়া দরকার।

কাকাবাবু ফার্স্ট গিয়ারে আস্তে-আস্তে চালাতে লাগলেন গাড়ি। তাঁর সামনে অচেনা, অন্ধকার পথ।

॥ ৬ ॥

করমণ্ডল এক্সপ্রেসে মুখোমুখি দুটি জানলার ধারে সিট পেয়েছে সন্তু আর জোজো। দু'জনেই পরে আছে জিন্সের প্যান্ট আর টি-শার্ট। জোজোরটা হলুদ আর সন্তুরটা মেরুন।

ওদের পরীক্ষা চলছিল বলে কাকাবাবু এবারে সঙ্গে নিতে চাননি। ফাইনাল পরীক্ষা নয়, ক্লাশ টেস্ট। এর মধ্যে কলেজের জলের ট্যাঙ্কে একটা ধেড়ে ইঁদুর পড়ে গিয়ে মরে পচে উঠেছিল, তাই শেষ দুটি পরীক্ষা বন্ধ হয়ে গেল। জলের ট্যাঙ্ক পরিষ্কার করে জীবাণুমুক্ত না হওয়া পর্যন্ত ক্লাশ চলতে পারে না। তাই গ্রীষ্মের ছুটি দিয়ে দেওয়া হল দু'দিন আগে। বাকি পরীক্ষা হবে ছুটির পর।

আকস্মিকভাবে এরকম ছুটি পেয়ে সন্তু বলেছিল, "ইস, যদি ট্রেনের টিকিট জোগাড় করা যেত, তা হলে কালই ভাইজাগ গিয়ে কাকাবাবুকে চমকে দিতাম। ভাইজাগ শহরটাও আমার খুব দেখার ইচ্ছে, ওখানে পাহাড় আর সমুদ্র একসঙ্গে দেখা যায়, ইন্ডিয়াতে এরকম জায়গা আর কোথাও নেই।"

জোজো ঠোঁট উলটে বলেছিল, "টিকিট জোগাড় করা তো ইজি। আমার বড়মামা রেলওয়ে বোর্ডের চেয়ারম্যান, ইন্ডিয়ার যে-কোনও জায়গার যে-কোনও ট্রেনের টিকিট উনি পাঁচ মিনিটে জোগাড় করে দিতে পারেন। চল তোকে নিয়ে যাচ্ছি।"

পর মুহূর্তেই মনে-পড়া ভঙ্গিতে বলেছিল, "ওঃ হো, ব্যাড লাক। বড়মামা যে এখন ছুটিতে, হিমালয়ে গেছেন, কী করে হবে?"

শেষপর্যন্ত সন্তুই তাদের পাড়ার বিমানদাকে বলে দুটো টিকিট পেয়ে গেছে। বিমানদার একটা ট্রাভেল এজেন্সির সঙ্গে চেনা আছে। ছুটি পড়ে গেছে, আর কাকাবাবুর কাছে যাচ্ছে শুনে বাবা-মাও আপত্তি করেননি।

দু'জনে দু' ঠোঙা চিনেবাদাম কিনে ভেঙে-ভেঙে খাচ্ছে আর খোসা ফেলছে জানলা দিয়ে।

জোজো পরপর তিনটে খোসা ভাঙল, তিনটেরই ভেতরের বাদাম পোকায় ধরা, চিমসে মতো।

জোজো বলল, "জানিস সন্তু, একবার আমি ট্রান্স সাইবেরিয়ান রেলওয়েতে যাচ্ছিলাম, সবসুদ্ধু ন'দিন লাগে, পৃথিবীর সবচেয়ে লম্বা ট্রেন জার্নি, সেই সময়

এক প্যাকেট বাদাম কিনেছিলাম, তোকে কী বলব, প্রত্যেকটা বাদামের দানা ধপধপে সাদা আর মাখনের মতো মুখে গলে যায়। অত ভাল বাদাম জীবনে খাইনি।"

সন্তু বলল, "রাশিয়ার বাদাম এত বিখ্যাত, তা তো জানতাম না!"

জোজো বলল, "আমেরিকার একজন প্রেসিডেন্ট ছিল জিমি কারটার, জানিস তো? সে আমার বাবার শিষ্য। ওই জিমি কারটারের চিনেবাদামের ব্যবসা, সে একবার বাবাকে বিরাট এক বস্তা বাদাম পাঠিয়েছিল, সেও খুব ভাল, কত লোককে যে বিলিয়েছি সেই বাদাম!"

সন্তু বলল, "আমি একটাও পাইনি।"

জোজো বলল, "তুই তো তখন কাকাবাবুর সঙ্গে আফ্রিকা গিয়েছিলি!"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই কখনও আফ্রিকা গেছিস?"

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, "অনেকবার। অন্তত সাত-আটবার তো হবেই। লাস্টবার যখন উগান্ডায় গিয়েছিলাম, রাত্তিরবেলা আমাদের তাঁবুতে একটা সিংহ ঢুকে পড়েছিল। ভাগ্যিস আগেই ঘুম ভেঙে গিয়েছিল আমার। কী করে বেঁচে গেলাম বল তো?"

সন্তু বলল, "এ গল্পটা আগে একবার শুনেছি মনে হচ্ছে। সবটা মনে নেই। কী করে বাঁচলি?"

জোজো বলল, "শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো। আমার বাবা তো দারুণ ঝাল খান, যেখানেই যান একটা কৌটো ভর্তি শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো নিয়ে যান। আমি দু' মুঠো শুকনো লঙ্কার গুঁড়ো ছুড়ে দিলাম সিংহটার চোখে। তখন সে বেচারা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করে হাঁচতে লাগল আর ভেউ-ভেউ করে কাঁদতে লাগল।"

সন্তু বলল, "হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তারপর তোর বাবা সেই সিংহটার গলায় দড়ি বেঁধে, কুকুরের মতন তাকে নিয়ে রোজ বেড়াতে যেতেন, না?"

জোজো বলল, "রোজ মানে মাত্র তিনদিন যাওয়া হয়েছিল। তারপর সিংহটাকে জঙ্গলে ছেড়ে দিয়ে আসা হয়। আর একটু হলেই পোষ মেনে যেত।"

সন্তু বলল, "তার চেয়ে বরং একটা গোরিলাকে পোষ মানিয়ে নিয়ে আসতে পারতিস। এখানে কাজে লেগে যেত।"

জোজো প্রসঙ্গ বদল করে, গলা নিচু করে বলল, "সন্তু, ডান দিকের কোণে জানলার কাছের লোকটাকে দেখ। বেশিক্ষণ তাকাসনি, একবার শুধু দেখে নে। খুবই সন্দেহজনক ব্যাপার।"

সন্তু ঘাড় ঘুরিয়ে একঝলক দেখে নিল লোকটিকে। পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একজন মাঝারি চেহারার লোক, এক হাতে সিগারেট, অন্য হাতে একটা ইংরেজি সিনেমার পত্রিকা খোলা।

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কেন, সন্দেহজনক কেন?"

জোজো বলল, "হাতে ম্যাগাজিন, কিন্তু পড়ছে না, বারবার তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। নির্ঘাত স্পাই। আমাদের ফলো করছে।"

সন্তু বলল, "আমাদের কেউ ফলো করতে যাবে কেন ?"

জোজো বলল, "কাকাবাবুর অনেক শত্রু আছে। আমাদের ফলো করে ওঁর কাছে পৌঁছতে চায়।"

সন্তু বলল, "ধ্যাত ! আমরা যে এই ট্রেনে চাপব, তা কালকেও ঠিক ছিল না। ওই লোকটাও বোধ হয় বাঘ-সিংহ পোষে, তোর গল্প শুনে কান খাড়া করেছে।"

জোজো বলল, "সরোজ চৌধুরী নামে ওড়িশার এক ফরেস্ট অফিসার একটা বাঘ পুষেছিলেন। আমাদের সঙ্গে খুব চেনা ছিল।"

সন্তু নিরীহভাবে জিজ্ঞেস করল, "কার সঙ্গে চেনা ছিল, বাঘটার সঙ্গে, না সরোজ চৌধুরীর সঙ্গে ?"

জোজো বলল, "সরোজবাবু আমাদের বাড়িতে অনেকবার এসেছেন। বাঘটাকে আমি তিন-চারবার দেখেছি। হঠাৎ বাঘটা কিছুদিনের জন্য বোবা হয়ে গিয়েছিল। একদম ডাকত না। বাঘ যদি মাঝে-মাঝে হালুম না করে, তবে তো সেটাকে বাঘ বলে মনেই হয় না। তেমন বাঘ পুষে লাভ কী ? আমার বাবা তখন সরোজবাবুকে বুদ্ধি দিলেন, বাঘটাকে যে মাংস খাওয়ানো হয়, তার সঙ্গে বেশ কয়েক গণ্ডা বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা বেটে মিশিয়ে দেবেন তো ! সেই লঙ্কা-মেশানো মাংস খেয়ে বুঝলি, বাঘটার যা তেজী গর্জন শুরু হয়ে গেল !"

সন্তু বলল, "বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা কেন ? অন্য জায়গার কাঁচালঙ্কা হবে না ?"

জোজো বলল, "নাঃ, তা হবে না। বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা যে ঝালের জন্য ওয়ার্ল্ড ফেমাস !"

সন্তু বলল, "আমি কোনওদিন বারুইপুরের কাঁচালঙ্কা খাব না। খেলে যদি বাঘের মতন গর্জন শুরু করি !"

জোজো বলল, "ওই লঙ্কার অনেক গুণও আছে। একবার সুন্দরবনে...."

পাজামা-পাঞ্জাবি পরা লোকটি উঠে এসে ওদের পাশ দিয়ে বাথরুমে গেল।

জোজো চোখ বড়-বড় করে বলল, "শুনতে পেলি, শুনতে পেলি, ক্লিক-ক্লিক শব্দ হল ?"

সন্তু বলল, "না, আমি শুনিনি তো ?"

জোজো বলল, "ওর হাতটা পাঞ্জাবির ডান পকেটে ছিল। গোপন ক্যামেরায় আমাদের ছবি তুলে নিল।"

সন্তু বলল, "ওকে আমাদের নাম-ঠিকানা দিয়ে বলব ছবির কপি পাঠিয়ে দিতে ?"

জোজো বলল, "তুই গুরুত্ব দিচ্ছিস না সন্তু। কিন্তু আমি লোক চিনতে

পারি। আমার চোখে ধুলো দেওয়া শক্ত।"

খানিক পরে খড়্গপুর স্টেশন এল। সেই লোকটি নেমে গেল পোঁটলাপুঁটলি নিয়ে।

সন্তু জোজোর দিকে তাকিয়ে ভুরু নাচাল।

জোজো বলল, "চেন সিস্টেম। আমরা ওকে চিনে ফেলেছি তো, তাই লোকটা নেমে গিয়ে অন্য একজনকে পাঠাবে। সে ফলো করবে আমাদের।"

তিনজন পুরুষ ও দু'জন মহিলা উঠল, তাদের প্রত্যেকের আপাদমস্তক দেখে নিল জোজো।

তারপর ফিসফিস করে বলল, "এই কামরায় ওঠেনি, ইচ্ছে করেই পাশের কামরায় উঠেছে। দেখবি, একটু পরেই একবার এসে ঘুরে যাবে।"

ট্রেনে যাওয়ার সময় অনবরত খিদে পায়। ফেরিওয়ালাও ওঠে নানারকম। ওরা মশলা মুড়ি, আঙুর ও শোনপাপড়ি খেতে-খেতে গল্প করতে লাগল।

মাঝে-মাঝে লোকজন হেঁটে যাচ্ছে মাঝখানের প্যাসেজ দিয়ে। একজন দাড়িওয়ালা প্যান্ট-শার্ট পরা লম্বা লোককে দেখে জোজো সন্তুর পায়ে একটা খোঁচা দিল। চোখের ইঙ্গিতে জানাল, 'এই সেই স্পাই!'

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "তুই কী করে বুঝলি?"

জোজো বলল, "ওর দাড়িটা ফল্স। আমি দেখেই বুঝেছি।"

সন্তু ফিসফিস করে বলল, "টেনে দেখব নাকি?"

জোজো বলল, "এমন ভাব কর, যেন আমরা কিছুই বুঝিনি। একবার কী হয়েছিল জানিস, বাবার সঙ্গে ট্রেনে যাচ্ছি রাজস্থান দিয়ে, সেই সময় আমাদের পেছনে স্পাই লেগেছিল।"

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কেন, স্পাই লেগেছিল কেন?"

"আমাদের কাছে যে একটা দারুণ দামি জিনিস ছিল।"

"দামি জিনিস থাকলে চোর-ডাকাত পিছু নিতে পারে। তারা স্পাই হবে কেন?"

"কারণ আছে। জয়সলমিরের রাজা মারা গেছেন কিছুদিন আগে। তাঁর বিষয়সম্পত্তি কে পাবে, তাই নিয়ে তাঁর তিন ছেলে আর এক ভাইপোর মধ্যে লড়ালড়ি লেগে গেছে। এদের মধ্যে যে মেজোকুমার, সেই সূরজপ্রসাদ আমার বাবার শিষ্য, খুব ভাল লোক, সবকিছু তারই প্রাপ্য, কারণ তার দাদাটা পাগল। সূরজপ্রসাদ বাবাকে ডেকে পাঠিয়েছিল। বাবা তার জন্য এমন একটা মন্ত্রপূত মাদুলি তৈরি করেছিলেন, যেটা হাতে দিলে তার ভাগ্য খুলে যাবেই। অন্য ভাইগুলো জেনে ফেলেছিল সেই মাদুলির কথা। তারা চাইছিল কিছুতেই যেন আমরা জয়সলমিরে ঠিক সময়ে পৌঁছতে না পারি। সেইজন্যই তিনটে স্পাই—"

"একজন নয়, তিনজন?"

"অন্য তিন ভাইয়ের তিনজন। আমি ঠিক চিনে ফেলেছি। বাবাকে চুপিচুপি জানিয়ে দিলুম। বাবা ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, তা হলে কী হবে ? আমি বললুম, তুমি চুপ করে শুয়ে থাকো, আমি সব ম্যানেজ করে দিচ্ছি !"

"তুই কী ম্যানেজ করলি ?"

"আমি করলুম কী, তিনজনের মধ্যে থেকে একজনকে বেছে নিয়ে নিজে ইচ্ছে করে তার সঙ্গে ভাব করলুম। সেবার আমাদের সঙ্গে প্রচুর পেস্তা-বাদাম আর কিশমিশ ছিল। পাকিস্তান থেকে ইমরান খান পাঠিয়েছিল বাবাকে। সেই একমুঠো পেস্তা বাদাম আর কিশমিশ নিয়ে লোকটাকে বললুম, খান না, খান না—"

"ইমরান খান পাঠিয়েছিল। তুই আমাকে একটুও দিলি না ?"

"তুই তখন কাকাবাবুর সঙ্গে কোথায় যেন গিয়েছিলি ....আগে শোন না ঘটনাটা। লোকটা তো দিব্যি খেতে লাগল। অন্য দু'জন লক্ষ করছে। তারা ভাবল, আমরা নিশ্চয়ই ওর দলে ভিড়ে গেছি। খানিকটা বাদে দেখি যে, সেই লোকটা নেই।"

"কোন লোকটা ?"

"সেই প্রথম স্পাইটা। যাকে আমি পেস্তা বাদাম কিশমিশ দিয়েছি। অন্য দু'জন তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ঠেলে ফেলে দিয়েছে।"

"কী সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার ! লোকটা মরে গেল ?"

"তা কে জানে ! স্পাইরা চলন্ত ট্রেন থেকে অনেকবার পড়ে যায়, সাধারণত ওদের কিছু হয় না।"

"আর বাকি দু'জন ?"

"একে বলে বিভেদনীতি, বুঝলি। বাকি দু'জনের মধ্য থেকে আমি আবার একজনকে বেছে নিয়ে ভাব জমালুম। তাকে দিলুম দু' মুঠো পেস্তা, বাদাম আর কিশমিশ। সেও হাসতে-হাসতে খেয়ে নিয়ে বলল, আর আছে ? ব্যস ! খানিক বাদে দেখি যে অন্য স্পাইটা একে আক্রমণ করেছে, দু'জনে দারুণ মারামারি শুরু হয়ে গেছে। একবার দু নম্বর জেতে, তিন নম্বর হারে, আর একবার তিন নম্বর জিতে যায়, দু নম্বর গড়াগড়ি দেয়। কামরার সব লোক দেখে-দেখে হাততালি দিতে লাগল। দু'জনেই প্রায় সমান-সমান। লড়াই শেষ হল না, তার মধ্যেই ট্রেন ঢুকে গেল জয়সলমির স্টেশনে। সেখানে মেজোকুমারের লোকজন অপেক্ষা করছিল, আমরা টপ করে তাদের গাড়িতে উঠে পড়লাম।"

সন্তু মুচকি হেসে বলল, "দারুণ গল্প, ভাল সিনেমা হয়। তুই গল্প লিখিস না কেন রে জোজো !"

জোজো বলল, "লিখব, লিখব, যখন লেখা শুরু করব, তখন দেখবি সব লেখকের ওপর টেক্কা দেব !"

জোজো আর সন্তুর ওপরে আর নীচে বাঙ্ক। জোজো আগেই বলে রেখেছে,

সে ওপরে শোবে। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়া শেষ করার পর কামরার সবাই যখন শুয়ে পড়ার ব্যবস্থা করছে, জোজো বলল, "দু'জনে একসঙ্গে ঘুমোব না, বুঝলি সন্তু। দাড়িওয়ালা স্পাইটা আরও দু-তিনবার ঘুরে গেছে। ওর কী মতলব কে জানে!"

সন্তু বলল, "তুই এবারেও যদি অনেকটা পেস্তা, বাদাম আর কিশমিশ আনতিস সঙ্গে, তা হলে ওর সঙ্গে ভাব জমানো যেত!"

জোজো এ-কথাটা না-শোনবার ভান করে বলল, "তুই প্রথম রাতটা ঘুমিয়ে নে, আমি জেগে পাহারা দেব। রাত দুটোর পর তুই জাগবি, আমি ঘুমোব।"

সন্তু চাদর পেতে আর একটা বালিশ ফুলিয়ে শুয়ে পড়ল। স্পাই নিয়ে সে মাথাই ঘামাচ্ছে না। কাকাবাবু এবার কোনও অভিযানে যাননি, কীসব মূর্তিটুর্তি দেখতে গেছেন। আর ওরা দু'জনও যাচ্ছে বেড়াতে। অন্য কেউ ওদের নিয়ে মাথা ঘামাবে কেন?

একটু পরে সে ওপরের বাঙ্কে উঁকি দিয়ে দেখল, জোজো অঘোরে ঘুমোচ্ছে। কোনওদিনই জোজো বেশি রাত জাগতে পারে না।

সন্তুও চোখ বুজে এক ঘুমে রাত কাবার করে দিল।

ঘুম ভাঙল লোকজনের চলাফেরায় আর কুলিদের চিৎকারে। একটা বড় স্টেশনে ট্রেন থেমেছে। জানলা দিয়ে উঁকি মেরে দেখল, সেই স্টেশনের নাম ওয়ালটেয়ার। সন্তু চমকে গিয়ে মহাব্যস্ত হয়ে পড়ল।

ওয়ালটেয়ার আর ভাইজাগ পাশাপাশি। এখানে নেমে ভাইজাগ যেতে হয়। জোজোকে ঠেলা মেরে সন্তু বলল, "ওঠ, শিগ্‌গির ওঠ, এখানে নামতে হবে।"

চোখ মুছতে-মুছতে নেমে জোজো বলল, "তোকে আর ডাকিনি, আমিই সারারাত জেগে পাহারা দিয়েছি। ঘুমিয়েছি তো এই মাত্র। সেই দাড়িওয়ালাটা দু-তিনবার আমাদের কাছ থেকে ঘুরে গেছে, আমি জেগে আছি দেখে—"

সন্তু বলল, "ভোরবেলা থেকেই গল্প শুরু করিস না জোজো। ব্রেকফাস্ট খাওয়ার আগে গল্প শোনা স্বাস্থ্যের পক্ষে ভাল নয়।"

সন্তু জানে, কাকাবাবু এখানকার পার্ক হোটেলে সাতদিনের জন্য ঘর বুক করেছেন। সেই হোটেল থেকে কলকাতায় ফোনও করেছিলেন। স্টেশনের বাইরে এসে একজন অটো রিকশা চালককে সেই হোটেলের নাম বলতে সে কুড়ি মিনিটের মধ্যে পৌঁছে দিল।

রিসেপশন কাউন্টারে রয়েছে একটি মেয়ে। সন্তু তাকে জিজ্ঞেস করল, "রাজা রায়চৌধুরীর রুম নাম্বার কত?"

মেয়েটি বলল, "উনি তো নেই। মিস্টার রায়চৌধুরী এই হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন!"

সন্তুর মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ল। সাতদিনের জন্য ঘর বুক করা, আজ

নিয়ে মোটে চারদিন। কাকাবাবু কোথায় চলে গেলেন ?

মেয়েটি জিজ্ঞেস করল, "তোমাদের কি আসবার কথা ছিল ? উনি কিছুই বলে যাননি তো। ওঁর কিছু জিনিসপত্র রেখে গেছেন, আবার নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন, কিন্তু ঘর ছেড়ে দিয়েছেন।"

সন্তু আড়ষ্টভাবে বলল, "না, আমরা হঠাৎ এসে পড়েছি। উনি অন্তত সাতদিন থাকবেন জানতাম।"

মেয়েটি দু'দিকে মাথা নাড়ল।

সন্তু তাকাল জোজোর দিকে। এখন উপায় !

কাকাবাবু কবে ফিরবেন, না ফিরবেন, কিছু ঠিক নেই। অনিশ্চিতভাবে এই হোটেলে দিনের পর দিন ঘরভাড়া নিয়ে থাকা যায় না। হোটেলটা বেশ বড়। সন্তু আর জোজো দু'জনের কাছে মিলিয়ে সবসুদ্ধু সাড়ে ছ'শো টাকা আছে, তাতে এখানকার একদিনের খরচও কুলোবে না। কোনও শস্তার হোটেল বা ধর্মশালা খুঁজতে হবে।

কাউন্টারের মেয়েটি বাঙালি। সে বুঝতে পেরেছে যে, এই কিশোর দুটি কোনও খবর না দিয়ে এসে বিপদে পড়েছে। সে বলল, "মিস্টার রাজা রায়চৌধুরী ফিরবেন ঠিকই, তবে কবে ফিরবেন বলেননি। খুব সম্ভবত উনি আরাকু ভ্যালিতে গেছেন। তুমি কি ওঁর আত্মীয় ?"

সন্তু বলল, "উনি আমার কাকা হন।"

মেয়েটি ঝলমলে হাসিমুখে বলল, "ও, তুমিই সন্তু ? তোমার কথা জানি। তোমার কাকাবাবুর আমি ভক্ত। তোমরা ইচ্ছে করলে আমার বাড়িতে থাকতে পারো। ওখানে তোমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। শুধু-শুধু কেন হোটেলে পয়সা খরচ করবে ?"

এখন মাত্র সাতটা বাজে। এর মধ্যেই হোটেলের লবিতে অনেক লোক ঘোরাফেরা করছে। একটু দূরে একজন লোক কাগজ পড়ছিল, সে এবার হঠাৎ উঠে এল কাউন্টারের কাছে। বেশ লম্বা। বলশালী চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, দেখলে মনে হয় পুলিশ।

সেই লোকটি সন্তুকে বলল, "তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো ? উনি তো আরাকু ভ্যালি গেছেন। তোমরা সেখানে চলে যেতে পারো।"

কাউন্টারের মেয়েটিও বলল, "হ্যাঁ, উনি একবার জিজ্ঞেস করেছিলেন আরাকু ভ্যালি এখান থেকে কত দূর।"

সন্তু বলল, "কত দূর ?"

কাউন্টারের মেয়েটি কিছু বলার আগেই লোকটি বলল, "বেশি দূর নয়, ট্রেনে ঘণ্টাচারেক লাগবে। সাড়ে আটটায় ট্রেন ছাড়বে। তোমরা এখনও গেলে ধরতে পারবে। রাজা রায়চৌধুরী ওখানেই আছেন আমি জানি।"

কাউন্টারের মেয়েটি বলল, "ট্রেনের নাম কিরনডোল এক্সপ্রেস। আরাকু

ভ্যালি এখান থেকে ১১৯ কিলোমিটার।”

এখানে আর দেরি করার কোনও মানে হয় না। ওরা দু’জনে হোটেল থেকে বেরিয়ে আবার একটা অটো রিকশা নিল।

জোজো জিজ্ঞেস করল, “আরাকু ভ্যালিতে কী আছে রে সন্তু ?”

সন্তু বলল, “ঠিক জানি না। ভ্যালি যখন, নিশ্চয়ই পাহাড় আছে। এখানকার সমুদ্রই দেখা হল না।”

জোজো বলল, “আমার পাহাড় বেশি ভাল লাগে। একবার আল্‌পস পাহাড়ে...”

সন্তু তাকে বাধা দিয়ে বলল, “দাঁড়া, স্টেশনে পৌঁছে আগে কিছু খেতে হবে।”

জোজো বলল, “আর একটা অটো রিকশায় আমাদের একজন ফলো করছে।”

সন্তু একবার ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে নিয়ে বলল, “আর জ্বালাসনি তো জোজো। অনেক রিকশা আসছে ! কাকাবাবু আরাকু ভ্যালিতে আছেন, এ তো কত লোকই জানে। হঠাৎ আমাদের কেউ ফলো করতে যাবে কেন ?”

জোজো বলল, “কিছু একটা কারণ নিশ্চয়ই আছে। পেছনের রিকশার একটা লোককে আমি হোটেলে দেখেছিলুম।”

সন্তু বলল, “হোটেলের আর কেউ স্টেশনে যেতে পারে না ?”

জোজো তবু বারবার তাকাতে লাগল পেছনে।

স্টেশনে পৌঁছে ওরা আগে দুটো টিকিট কেটে নিল। এক জায়গায় গরম-গরম পুরি ভাজছে, সেখানে পাঁচখানা করে পুরি আর আলুর তরকারি খাওয়ার পর সন্তু বলল, “জোজো, আরও খাবি নাকি ? পেট ভরে খেয়ে নে। দুপুরে খাবার পাওয়া যাবে কি না, তা তো জানি না !”

জোজো বলল, “কেন, ফক্কা ভ্যালিতে খাবার পাওয়া যায় না ?”

সন্তু বলল, “ফক্কা ভ্যালি না, আরাকু ভ্যালি। সে জায়গাটা কী রকম আমি জানি না। শহর না গ্রাম, তা জানি না। কাকাবাবু কোথায় উঠেছেন, তা জানি না। কাকাবাবু এর মধ্যে সে জায়গাটা ছেড়ে অন্য কোথাও চলে যেতে পারেন, তাঁর দেখা পাব কি না জানি না।”

জোজো বলল, “এত জানি না বলছিস, তা হলে আমরা সেখানে যাচ্ছি কেন ?”

সন্তু বলল, “বাঃ, কাকাবাবুর খোঁজ করতে হবে না ? এখানে শুধু-শুধু পড়ে থেকে লাভ কী ?”

জোজো বলল, “সেখানেও যদি আমরা থাকার জায়গা না পাই ?”

সন্তু বলল, “গাছতলায় শুয়ে রাত কাটাব। পারবি না ?”

জোজো ঠোঁট বেঁকিয়ে বলল, “কেন পারব না ? কত রাজা-মহারাজার

বাড়িতে থেকেছি। ফাইভ স্টার হোটেলে থেকেছি। আবার গাছতলাতেও অনায়াসে থাকতে পারি।”

ট্রেন এবার ছাড়বে। সিট রিজার্ভ করা নেই, যে-কোনও কামরায় ওঠা যায়। ওদের সঙ্গে একটা করে বড় ব্যাগ, কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছে। হাঁটতে-হাঁটতে একটা কামরা একটু ফাঁকা দেখে সন্তু উঠতে যাচ্ছে, জোজো তাকে বাধা দিয়ে বলল, “এটাও নয়।”

সন্তু জিজ্ঞেস করল, “কেন, এটা কী দোষ করল ?”

জোজো চোখ ঘুরিয়ে বলল, “দু'জন সন্দেহজনক চেহারার লোক বসে আছে।”

সন্তু হেসে ফেলে বলল, “আঃ জোজো, তোকে নিয়ে আর পারি না ! সব জায়গায় তুই ভূত দেখছিস !”

জোজো সন্তুকে টেনে নিয়ে আবার তিনটে কামরা ছাড়িয়ে, চতুর্থটায় উঠল। সেটায় বেশ ভিড়। প্রথমটায় বসবার জায়গাই পাওয়া গেল না, ট্রেন চলতে শুরু করার পর দু'জনে আলাদা-আলাদা চেপেচুপে কোনওরকমে বসল। জোজোর থেকে সন্তু অনেকটা দূরে, এইরকম অবস্থায় চেঁচিয়ে গল্প করা যায় না।

বেশ কিছুক্ষণ সমতলে চলার পর ট্রেনটা উঠতে লাগল পাহাড়ে। কামরায় ভিড়ও কমে এল। দুপাশেই পাহাড়, প্রচুর গাছপালায় ভরা, অজস্র বুনো ফুল ফুটে আছে। মাঝে-মাঝে ছোট-ছোট ঝরনা কিংবা নদী। খুব ছোট্ট-ছোট্ট স্টেশনে ট্রেন থামছে, দু-একজন করে লোক নেমে যাচ্ছে, দু-একজন লোক উঠছে। অন্য কামরা থেকেও লোক যাতায়াত করছে মাঝে-মাঝে।

পাশের লোকদের সঙ্গে জোজো ভাব জমাবার চেষ্টা করেও পারল না। শহরের লোকেরা তবু কিছু-কিছু ইংরেজি জানে, গ্রামের লোকেরা তো তেলুগু ভাষা ছাড়া কিছুই বোঝে না।

সন্তু বলল, “তুই পাহাড় ভালবাসিস, দেখ না দু'পাশটা কী সুন্দর। দার্জিলিং-এ ছোট ট্রেন, আস্তে-আস্তে যায়, এখানে বড় ট্রেন পাহাড়ের ওপর দিয়ে কত জোরে যাচ্ছে দেখেছিস ? আশ্চর্য না ?”

জোজো বলল, “আমি আল্‌পস আর রকি অ্যান্ডিজ পাহাড়ে এ রকম ট্রেনে কতবার চেপেছি !”

সন্তু বলল, “‘ধ্যানগম্ভীর ঐ যে ভূধর। নদী জপমালা ধৃত প্রান্তর। হেথায় নিত্য হের পবিত্র ধরিত্রীরে..' এটা কার লেখা বল তো ?”

জোজো অবহেলার সঙ্গে বলে বসল, “পরের লাইনটা বলে দিচ্ছি ‘এই ভারতের মহামানবের সাগরতীরে'।”

সন্তু বলল, “তুই আল্‌পস বা রকি অ্যান্ডিজ ঘুরে আসতে পারিস। আমি তো অত জায়গায় যাইনি। আমাদের দেশেই কত অপূর্ব সুন্দর জায়গা আছে।

দেখে-দেখে শেষ করা যায় না।"

জোজো বলল, "একটা ভুল হয়ে গেছে। বেশ কয়েক প্যাকেট বিস্কিট আর কাজুবাদাম কিনে আনা উচিত ছিল ভাইজাগ থেকে। দুপুরে আর কিছু পাওয়া না গেলে ওইগুলোই খেতাম।"

সন্তু বলল, "এর মধ্যেই তোর খাবার চিন্তা! এই তো কিছুক্ষণ আগে অত পুরি খেলি!"

জোজো বলল, "ভাল-ভাল দৃশ্য দেখলেই আমার খিদে পেয়ে যায়। এটা বিচ্ছিরি ট্রেন, কোনও ফেরিওয়ালা ওঠে না।"

হঠাৎ অন্ধকার হয়ে গেল। ট্রেন একটা টানেলে ঢুকেছে। একটু পরেই আর-একটা।

সন্তু বলল, "একবার দিল্লি থেকে সিমলা যাওয়ার সময় এ রকম টানেল দেখেছি।"

জোজো বলল, "ব্রাজিলে একবার ট্রেনে চেপেছিলাম, সেখানে কত যে টানেল, একত্রিশ-বত্রিশটা তো হবেই।"

সন্তু বলল, "এখানে ক'টা টানেল পড়ে, গোনা যাক তো!"

জোজো বলল, "কোনও স্টেশনে বাদামও পাওয়া যায় না?"

সন্তু বলল, "তিন নম্বর টানেল গেল!"

এর পর ঘন-ঘন টানেল আসতে লাগল। কোনওটা ছোট, কোনওটা বেশ লম্বা। ট্রেন বেশ উঁচু দিয়ে চলেছে, এক-এক জায়গায় দেখা যায় গভীর খাদ, অনেক নীচে গ্রাম।

জোজো বলল, "পাহাড় ভাল, কিন্তু বেশিক্ষণ ভাল নয়। এখন পৌঁছে গেলেই ভাল লাগবে।"

সন্তু বলল, "তুই একত্রিশ-বত্রিশটা টানেল দেখার কথা বলেছিলি। এখানে এর মধ্যেই চৌত্রিশটা আমি গুনেছি। মনে হচ্ছে আরও আছে।"

কামরায় এখন সবসুদ্ধু দশ-বারোজন যাত্রী। কেউ কথা বলছে না। কয়েকজন বসে-বসে ঢুলছে, দু'জন মুখোমুখি বসে তাস পেটাচ্ছে। টানেলের মধ্যে ট্রেনটা ঢুকলে যখন ঘুটঘুট্টি অন্ধকার হয়ে যায়, তখন নিজের হাতটাও দেখা যায় না।

সন্তু বলল, "এখানে ট্রেন লাইন বানাতে অনেক খরচ হয়েছে। এত টানেল, আবার অনেক ব্রিজও দেখলাম।"

জোজো বিরক্তভাবে বলল, "কয়েকটা ভাল ভাল স্টেশন আর ভাল-ভাল দোকান বানাতে পারেনি? স্টেশনগুলোর যা বিচ্ছিরি চেহারা, আমার মনে হচ্ছে সন্তু তামান্না ভ্যালিতেও কিছু পাওয়া যাবে না।"

সন্তু বলল, "তামান্না ভ্যালি আবার কোথায়? আমরা যাচ্ছি আরাকু ভ্যালিতে।"

জোজো বলল, "এক-একটা জায়গার নাম কিছুতেই মনে থাকে না। আরাকু, আরাকু, আর ভুলব না।"

সন্তু বলল, "তোর এরকম নিরিবিলি খুদে স্টেশন ভাল লাগে না ? আমার দেখলে এমন মায়া লাগে, ইচ্ছে হয় সেখানেই নেমে পড়ি, সেখানেই থেকে যাই।"

আবার একটা লম্বা টানেল, মিশমিশে অন্ধকার। ট্রেনটা আস্তে চলছে। সন্তু চুপ করে গেছে। জোজো বেশিক্ষণ কথা না বলে থাকতে পারে না। সে বলল, "এই টানেলটাই বোধ হয় সবচেয়ে বড়, তাই না ?"

সন্তু কোনও উত্তর দিল না।

জোজো বলল, "দিনের বেলা অন্ধকার আমি একেবারে পছন্দ করি না।"

সন্তু তাও কিছু বলল না।

ট্রেনটা আবার টানেলের বাইরে এল। দিনের আলোয় ভরে গেল কামরাটা। যেন হঠাৎ রাত্তির, হঠাৎ দিন।

জোজো দেখল উলটো দিকের সিটে সন্তু নেই।

সমস্ত কামরাটা সে চোখ বুলিয়ে দেখল, সন্তুকে খুঁজে পেল না। তা হলে নিশ্চয়ই বাথরুমে গেছে।

পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল, তবু সন্তু ফিরল না। বড় বাথরুম ? সন্তু কিছু বলে গেল না কেন ?

অস্থিরভাবে সে উঠে গিয়ে দেখল, দুটি বাথরুমের দরজা খোলা।

জোজো চেঁচিয়ে ডাকল, "সন্তু, সন্তু !"

কেউ সাড়া দিল না। সন্তু কি তার সঙ্গে মজা করার জন্য লুকিয়ে পড়েছে ? কোথায় লুকোবে ? এর মধ্যে ট্রেন কোথাও থামেনি। জোজো বেঞ্চগুলোর তলায় উঁকি মেরে দেখল।

জোজো এবার কামরার লোকগুলোর দিকে তাকিয়ে ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "আমার বন্ধু কোথায় গেল ? আপনারা কেউ দেখেছেন ?"

লোকগুলো ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল শুধু।

হঠাৎ জোজোর সমস্ত শরীর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল।

ট্রেন থামেনি, সন্তু ছাড়াও কামরায় লোক যেন কমে গেছে এর মধ্যে। যে-লোকদুটি তাস খেলছিল, সেই দু'জনও নেই।

জোজো খোলা দরজার কাছে গিয়ে চিৎকার করে ডাকল, "সন্তু, সন্তু—

জোজোর বুকটা ধকধক করছে। সন্তু এতটা রসিকতা করবে না তার সঙ্গে। সে নেই, নিশ্চয়ই তার কোনও বিপদ হয়েছে। কাকাবাবুকে সে কী বলবে? যে লোকদুটো তাস খেলছিল, তারাই ছিল স্পাই। জোজো কতবার বলেছে, তবু সন্তু বিশ্বাস করতে চায়নি।

কাকাবাবু যে জায়গাটায় আছেন, সে জায়গাটার নাম যেন কী? ফক্কা ভ্যালি? তামান্না ভ্যালি? কুঝিকমিক ভ্যালি? একটু আগে এত করে মুখস্থ করল, তবু এখন মনে পড়ছে না। মনে না পড়লে সেই স্টেশনে নামবে কী করে? নামটা লিখে রাখা উচিত ছিল। টিকিটও তো সন্তুর কাছে। যাঃ, কী হবে, বিনা টিকিটের যাত্রী হিসেবে তাকে পুলিশে ধরবে?

সন্তুর ব্যাগটাও রয়ে গেছে। তার মানে সে ইচ্ছে করে কোথাও নামেনি। এক হতে পারে, সন্তু কোনও কারণে, অন্য কামরায় লুকিয়ে পড়েছে, ঠিক স্টেশনে এসে পড়বে। তাই আসুক, তাই আসুক। তারপর সন্তুকে জোজো বেশ কয়েকটা গাঁট্টা মারবে, আগে তো সন্তু আসুক!

দুটো-তিনটে ছোট-ছোট স্টেশনে দাঁড়াবার পর ট্রেনটা একটা মাঠের মধ্যে থামল। জোজো দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। পাশ দিয়ে একটা লোক সেখানেই নেমে পড়তে-পড়তে বলল, ‘অ্যার্কু ভ্যালি।”

জোজো চমকে উঠল। নামটা মনে পড়ে গেছে। কিন্তু আরাকু আর অ্যার্কু কি একই জায়গা?

মাঠের মধ্যে একটি ষোলো-সতেরো বছরের ছেলে দাঁড়িয়ে আছে। সে জোজোর দিকে হাতছানি দিয়ে বলল, “কাম কাম, অ্যার্কু ভ্যালি।”

ট্রেন আবার হুইশ্‌ল দিয়েছে। জোজো ব্যাগদুটো নিয়ে লাফিয়ে নেমে পড়ল। স্টেশন নেই, প্ল্যাটফর্ম নেই, টিকিট চেকারও নেই। শুধু একটা বোর্ডে লেখা আছে আরাকু ভ্যালি। স্টেশন এখনও তৈরিই হয়নি।

সেই ছেলেটি জোজোর ব্যাগদুটো বইবার ভঙ্গি করে বলল, “টুরিস্ট লজ?”

জোজোর মতো শহুরে পোশাক পরা যাত্রী আর সেই কামরায় ছিল না। সেইজন্যই জোজোকে দেখে সে ভেবেছে, এখানেই নামবে। বাইরের লোকরা এখানে বেড়াতে আসে, এই ছেলেটি জিনিসপত্র বইবার কাজ করে।

চলন্ত ট্রেনটার দিকে চেয়ে রইল জোজো। শেষ মুহূর্তেও সন্তু নামল না। জোজোর বুকটা হতাশায় ভরে গেল। একা-একা সে এখন কী করবে?

টুরিস্ট লজ যখন আছে, সেখানেই কাকাবাবুর খোঁজ পাওয়া যেতে পারে।

যত এলেবেলে জায়গা ভেবেছিল জোজো, তেমন নয়। পাকা রাস্তা দিয়ে বাস চলে, একটা বাসস্ট্যান্ডও আছে। রাস্তার দু'ধারে বেশ কিছু দোকানপাট, ভাতের হোটেলও রয়েছে। হোটেলের বাইরের বোর্ডে লেখা আছে কী-কী

খাবার পাওয়া যায়। জোজো দেখে নিল, চিকেন কারি, মাটন কারি, ডিমের ঝোল কিছুরই অভাব নেই। খুব একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নয়, কিন্তু খাওয়া তো যাবে।

টুরিস্ট লজ বেশ বড় হয়, এটা টুরিস্ট গেস্ট হাউস। সেখানে পৌঁছে জোজো আর-একটা দুঃসংবাদ পেল।

রাজা রায়চৌধুরী এখানে একটি ঘর নিয়েছিলেন বটে, কিন্তু দু'দিন ধরে তিনি ফেরেননি। তিনি যে গাড়ি নিয়ে গিয়েছিলেন, সেই গাড়ির ড্রাইভার ফিরে এসেছে। গাড়ি খারাপ হয়ে গিয়েছিল, সে পরদিন মেকানিক নিয়ে গিয়ে সারিয়েছে, কিন্তু সেখানে রাজা রায়চৌধুরীর সন্ধান পাওয়া যায়নি। তিনি নিরুদ্দেশ হয়ে গেছেন।

গেস্ট হাউসের ম্যানেজার রাগ-রাগ ভাব করে বলল, "সেই ঘরের তালা খুলে দেখা গেছে, একটা ব্যাগে দু-তিনটে জামা-কাপড় ছাড়া দামি জিনিস কিছু নেই। আগে থেকে ভাড়ার টাকা নেওয়া হয়নি, খোঁড়া লোকটি নিশ্চয়ই ভাড়া ফাঁকি দিয়ে পালিয়েছে।"

কাকাবাবুর নামে এরকম অপবাদ সহ্য করতে পারল না জোজো। তার কাছে এখনও সাড়ে তিনশো টাকা আছে। এখানকার ঘরভাড়া ষাট টাকা। সে বলল, "তিনদিনের ঘরভাড়া আমি এখনই দিয়ে দিচ্ছি। উনি নিশ্চয়ই ফিরে আসবেন। ওই ঘরে আমি থাকব।"

ঘরে ঢুকে খাটের ওপর হাত-পা ছড়িয়ে শুয়ে পড়ল জোজো। বুকটা ফাঁকা-ফাঁকা লাগছে। সন্তুকে ছাড়া সে কোথাও একা যায়নি। সন্তুও নেই, কাকাবাবুও নেই, এখন সে কী করবে? মাথা ঠাণ্ডা রেখে ভেবেচিন্তে ঠিক করতে হবে।

এখানে দুপুরের খাবার পাওয়া যাবে না। খেতে হবে বড় রাস্তার ধারের কোনও হোটেলে। জোজোর যদিও খিদে পেয়েছে, তবু যেতে ইচ্ছে করছে না। একলা-একলা হোটেলে বসে খেতে কেমন যেন বোকা-বোকা লাগে।

বাথরুমের কলে টপ-টপ করে জল পড়ছে। জোজো একবার উঠে গিয়ে কলটা বন্ধ করার চেষ্টা করল, কিন্তু সেটা টাইট হয় না। অনবরত জল পড়ার শব্দ শুনলে বিচ্ছিরি লাগে।

ভেবেচিন্তে কিছুই ঠিক করতে না পেরে জোজো শুয়েই রইল। খিদেয় পেট চিনচিন করছে। তবু সে মনে-মনে বলল, "সন্তু কিছু খেয়েছে কি না জানি না। সেইজন্য আমিও খাব না।"

সে আশা করতে লাগল, কাকাবাবু নিশ্চয়ই যে-কোনও মুহূর্তে ফিরে আসবেন। কাকাবাবু এলেই নিশ্চিন্ত। কাকাবাবু ঠিক সন্তুকে খুঁজে বার করবেন।

এক সময় সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তার ঘুম ভাঙল দরজায় ঠক-ঠক শব্দ শুনে। ধড়মড় করে উঠে বসে সে দেখল, এর মধ্যে বিকেল পেরিয়ে সন্ধে হয়ে গেছে। ঘর অন্ধকার।

আলো জ্বেলে সে দরজা খুলল।

একজন বেশ লম্বা-চওড়া লোক কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। চোখের দৃষ্টি কটমটে ধরনের।

জোজোর বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠল, 'এও একজন স্পাই?'

লোকটি জিজ্ঞেস করল, "রাজা রায়চৌধুরী কোথায়?"

জোজো শুকনো মুখে বলল, "উনি ফেরেননি।"

লোকটি কড়া গলায় বলল, "ফেরেননি মানে? দু' দিন ধরেই তো ফেরেননি শুনেছি। কোথায় গেছেন তুমি জানো না? তুমি কে?"

জোজো বলল, "আমি ওঁর ... মানে উনি আমার কাকা।"

লোকটি বলল, "পরশু যখন ওঁর সঙ্গে আমার দেখা হয়, তখন তো কোনও ভাইপো-টাইপো ছিল না। তুমি কোথা থেকে এলে?"

জোজো বলল, "কলকাতা থেকে। আপনি কে?"

লোকটি বলল, "আমার নাম বিসমিল্লা খান। এখানকার থানার ও. সি.।"

জোজো হাঁফ ছেড়ে বলল, "ওঃ পুলিশ। যাক, বাঁচা গেল। আপনার সঙ্গে আমার অনেক কথা আছে। আপনি ভেতরে এসে বসবেন?"

বিসমিল্লা খান ভুরু নাচিয়ে বলল, "তাই নাকি, আমার সঙ্গে কথা আছে। কিন্তু আমি তো এখানে বসতে পারব না। তুমি আমার সঙ্গে থানায় চলো। ভাইজাগ থেকে ঘন-ঘন ফোন আসছে। মিস্টার রাজা রায়চৌধুরীকে খুঁজে বার করতে না পারলে আমার চাকরি চলে যাবে।"

জিপে চড়ে একটুক্ষণের মধ্যেই ওরা পৌঁছে গেল থানায়।

নিজের চেয়ারে বসে বিসমিল্লা বলল, "আমার সন্ধেবেলায় চা খাওয়া হয়নি। তুমি চা খাও তো?"

জোজো ঘাড় হেলাতেই বিসমিল্লা চায়ের জন্য হাঁক দিল। সঙ্গে-সঙ্গে ঝনঝন করে ফোন বাজল।

দু'কাপ চায়ের সঙ্গে এল এক প্লেট বিস্কুট। বিসমিল্লা এখনও ফোনে কথা বলে যাচ্ছে, জোজো লোভীর মতো চার-পাঁচখানা বিস্কুট খেয়ে ফেলল।

ফোন নামিয়ে রেখে বিসমিল্লা বলল, "আবার ডি আই জি সাহেব খোঁজ নিচ্ছিলেন। রাজা রায়চৌধুরী কোথায় গেলেন, তুমি কিছু জানো না?"

জোজো বলল, "না, জানি না। আমার বন্ধু সন্তুও হারিয়ে গেছে।"

বিসমিল্লা দু'হাত ঝাঁকিয়ে বলল, "অ্যাঁ? আবার একজন হারিয়ে গেছে? সবাই এখানে হারাতে আসে কেন? অন্য জায়গায় হারালেই পারে। আমি এত পারব কী করে? আমার এখানে একখানা মাত্র জিপ। তা দিয়ে আমি থানা সামলাব, না লোক খুঁজতে বেরোব।"

জোজো ঘাবড়ে গিয়ে চুপ করে গেল।

বিসমিল্লা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পরে বলল, "আর তুমি ? তুমিও হারিয়ে গেছ নাকি ?"

জোজো বলল, "আজ্ঞে না। আমি হারিয়ে যাইনি। আমি তো আপনার সামনেই বসে আছি।"

বিসমিল্লা জিজ্ঞেস করল, "তোমার বন্ধু, তার কী হয়েছে, সে কোথায় হারিয়েছে ?"

জোজো বলল, "সে আমার সঙ্গে আসছিল। চলন্ত ট্রেন থেকে তাকে আর দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না।"

বিসমিল্লা এবার চেয়ারে হেলান দিয়ে বলল, "চলন্ত ট্রেন থেকে ? বাঁচা গেল ! সেটা আমার দায়িত্ব নয়। রেল-পুলিশকে খবর দাও। স্টেশনমাস্টারকে জানিয়েছ ?"

জোজো বলল, "আরাকু ভ্যালিতে নামলুম, সেখানে স্টেশনই নেই। স্টেশনমাস্টারকে পাব কোথায় ?

বিসমিল্লা বলল, "হুঁ, ওখানে স্টেশন নেই বটে। কিন্তু আর-একটু দূরে শুধু আরাকু নামে একটা স্টেশন আছে। সেখানে স্টেশনমাস্টার আছে। সেখানে গিয়ে যা বলার বলো ! অবশ্য সেখানে খবর দিলেও কিছু লাভ হবে না। তারা কিছুই করতে পারবে না। চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ হারাতে পারে নাকি ? নিশ্চয়ই অন্য কোনও স্টেশনে নেমে গেছে।"

জোজো বলল, "ট্রেনটা একটা অন্ধকার টানেলের মধ্যে ঢুকেছিল, তারপর আর তাকে দেখা গেল না।"

বিসমিল্লা বলল, "তা হলে হারিয়ে যায়নি, অদৃশ্য হয়ে গেছে। এটা আলাদা কেস। তোমার কাছে সেই বন্ধুর কোনও ছবি আছে ?"

জোজো বলল, "না, ছবি তো নেই।"

বিসমিল্লা বলল, "বা বা বা বা। সে অদৃশ্য হয়ে গেছে, তার ছবিও তোমার কাছে নেই। তা হলে কী করে বুঝব যে তোমার সঙ্গে একজন বন্ধু ছিল ? যদি বলি, কেউ ছিল না ? কিংবা, তুমিই তাকে চলন্ত ট্রেন থেকে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিয়েছ ?"

জোজো আঁতকে উঠে বলল, "অ্যাঁ ! না না, সন্তু আমার শ্রেষ্ঠ বন্ধু, তাকে আমি ফেলে দেব কেন ?"

বিসমিল্লা বলল, "লোকে কেন খুন করে, কেন ডাকাতি করে, সে তারাই ভাল জানে ! মোট কথা, চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ কখনও অদৃশ্য হয় না। তুমি যা বললে, তাতে তোমাকেই জেলে ভরে দেওয়া উচিত।"

জোজো কাঁচুমাচু মুখে চুপ করে গেল।

বিসমিল্লা বলল, "তোমাদের ব্যাপার কী বলো তো ? তোমার কাকা অদৃশ্য

হয়ে গেছেন। তোমার বন্ধু অদৃশ্য হয়ে গেল। তুমিও কি এখানে অদৃশ্য হওয়ার জন্য এসেছ? এর আগেও তো এখানে অনেক বাঙালি এসেছে, তারা তো কেউ অদৃশ্য হয়নি।"

জোজো মিনমিন করে বলল, "আমার অদৃশ্য হওয়ার একটুও ইচ্ছে নেই, বিশ্বাস করুন!"

বিসমিল্লা বলল, "তা হলে যাও, টুরিস্ট লজে গিয়ে শুয়ে থাকো। এই রাত্তিরে তো কিছু করা যাবে না। ভাল করে দরজা-টরজা বন্ধ করে ঘুমোবে। খবরদার, অদৃশ্য হোয়ো না। কাল সকালে তোমার কাকাবাবুকে খুঁজতে বেরোব। চতুর্দিকে এত পাহাড়, এর মধ্যে কোথায় খুঁজব, তাই-বা কে জানে! ভাইজাগের বড়কর্তারা তো কিছু বুঝবে না।"

আর দু'জন লোক ঘরে ঢুকে বিসমিল্লার সঙ্গে কথা বলতে লাগল। একটু পরে সে মুখ তুলে বলল, "তুমি আর বসে রইলে কেন, তোমাকে তো ধরে রাখছি না। তুমি যেতে পারো।"

জোজোর খুব অভিমান হল। ফেরার সময়ে আর তাকে গাড়ি দেবে না? তাকে হেঁটে যেতে হবে। সে এখানকার রাস্তা চেনে না।

আস্তে-আস্তে সে বেরিয়ে এল থানা থেকে। রাস্তা একেবারে অন্ধকার। কিছু লোক অবশ্য হাঁটছে টর্চ জ্বেলে। দূরে দেখা যাচ্ছে কিছু দোকানের আলো।

ঠিক কোনও কারণ নেই, তবু জোজোর গা ছমছম করতে লাগল। সন্তু কোথায় গেল সে কিছুই বুঝতে পারছে না। পুলিশও কোনও সাহায্য করল না। কাকাবাবুও কোথায় লুকিয়ে রইলেন?

টুরিস্ট গেস্ট হাউসের ঘরটা কেমন স্যাঁতসেঁতে, এমনিতেই দমবন্ধ হয়ে আসে। রাত্তিরে ওই ঘরে তাকে একলা থাকতে হবে? জোজো কোনওদিনই রাত্তিরে একা শুতে পারে না। অন্যরা শুনলে হাসবে তাই সে বলে না, কিন্তু সে ভূতের ভয় পায়। এরকম অচেনা জায়গায় একা থাকা তো আরও ভয়ের ব্যাপার। সন্তু তাকে কী বিপদেই না ফেলে গেল!

একটা দোকানে ঢুকে জোজো পেট ভরে রুটি-মাংস খেয়ে নিল। পেটে খিদে থাকলে ঘুমই আসত না। সমস্ত দরজা-জানলা বন্ধ করে দিয়ে চাদর মুড়িসুড়ি দিয়ে কোনওমতে রাতটা কাটিয়ে দিতে হবে।

জোজো ঘরে তালা লাগিয়ে চাবিটা পকেটে নিয়ে বেরিয়েছিল। ফিরে এসে দেখল, তালা নেই। দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল।

জোজোর বুকটা কেঁপে উঠল খুব জোরে। একবার সে ভাবল, পেছন ফিরে দৌড় মারবে কি না। তার বিছানায় কে যেন শুয়ে আছে!

দরজা ঠেলার শব্দ পেয়ে লোকটি মুখ ফেরাল। যেমন ভয় পেয়েছিল, তেমনই হঠাৎ জোয়ারের মতো আনন্দে জোজোর বুক ভরে গেল। সে

ব্যাকুলভাবে ডেকে উঠল, "কাকাবাবু ! আপনি ফিরে এসেছেন ?"

কাকাবাবুও বেশ অবাক হয়ে বললেন, "জোজো, তুই ! ওরা যে বলল, একজন ছেলে এসেছে। তাই আমি ভাবলাম, সন্তু বুঝি চলে এসেছে হঠাৎ। তোরা দু'জনেই এসেছিস ? সন্তু কোথায় ?"

জোজো এবার আর নিজেকে সামলাতে পারল না। দেওয়ালে হেলান দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল, দু'হাত চাপা দিল মুখে।

কাকাবাবু উঠে এসে বললেন, "এ কী রে জোজো, কী হল। কাঁদছিস কেন ?"

জোজো আর কথা বলতেই পারছে না।

কাকাবাবু তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে-দিতে বললেন, "তোকে তো কখনও কাঁদতে দেখিনি। জোজোকে মহা বীরপুরুষ বলেই তো জানি। কত দেশ-বিদেশ ঘুরেছিস !"

একটু পরে কিছুটা সামলে নিয়ে জোজো চোখ মুছতে-মুছতে বলল, "সন্তু নেই। আমরা একসঙ্গে ট্রেনে আসছিলাম, হঠাৎ অন্ধকারের মধ্যে.... সন্তু কোথায় চলে গেল... নিশ্চয়ই কেউ ধরে নিয়ে গেছে.... থানা থেকে কোনও সাহায্য করল না।"

কাকাবাবু বললেন, "বোস তো ! সবটা খুলে বল।"

জোজোর মুখে সব ঘটনাটা শুনে কাকাবাবু একটুক্ষণ চুপ করে রইলেন। তারপর আপন মনে বললেন, "সন্তুকে ধরে নিয়ে গেছে। তোকে আর সন্তুকে ওরা চিনল কী করে ? আমি ওদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার পর ওরা নিশ্চয়ই এই গেস্ট হাউস আর ভাইজাগের হোটেলে নজর রেখেছিল। ভেবেছিল আমি এর কোনও এক জায়গায় ফিরব। ভাইজাগের পার্ক হোটেলের লবিতে ওদের কোনও লোক ছিল, সে তোদের কথাবার্তা শুনেছে।"

জোজো বলল, "একটা লোক বারবার আমাদের আরাকু ভ্যালিতে যাওয়ার কথা বলছিল।"

কাকাবাবু বললেন, "সে-ই অন্য দু'জন লোককে তোদের সঙ্গে সঙ্গে পাঠিয়েছে।"

জোজো উত্তেজিতভাবে বলল, "আমি বলেছিলুম, আমি বলেছিলুম, স্পাইরা আমাদের ফলো করছে, সন্তু বিশ্বাস করেনি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তু যে বেশি-বেশি সাহস দেখাতে চায়।"

জোজো বলল, "এখানকার থানার ও. সি., কী যেন নাম, বড়ে গোলাম আলি না কী যেন, তিনি কোনও সাহায্য করতে রাজি হলেন না। সন্তুর কথা শুনলেনই না ভাল করে। তবে, আপনার জন্য খুব চিন্তিত।"

কাকাবাবু সে-কথা না শুনে বললেন, "সন্তু ঘাবড়াবে না, আগেও অনেকবার এরকম হয়েছে। কিন্তু এই লোকগুলো খুব নিষ্ঠুর। আমাকে তো মেরে ফেলার

অনেক চেষ্টা করেছে, পারেনি। সন্তু পালাবার চেষ্টা করলে যদি প্রাণে মেরে ফেলে ?"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "ওরা কারা ?"

কাকাবাবু চিন্তিতভাবে বললেন, "ওদের তো চিনি। কিন্তু ওরা যে কেন আমার সঙ্গে এত শত্রুতা করছে, সেটাই বুঝতে পারছি না। হয়তো পুরনো কোনও রাগ আছে। হয়তো ওদের দলের কাউকে আগে কখনও শাস্তি দিয়েছি।"

হঠাৎ যেন কিছু মনে পড়ে যাওয়ায় কাকাবাবু উঠে দাঁড়িয়ে ব্যস্ত হয়ে বললেন, "জোজো, শিগ্‌গির সব জিনিসপত্র গুছিয়ে নে । একটু পরেই একটা ট্রেন আছে, তাতে ফিরে যাওয়াই ভাল। আমি যে এখানে ফিরে এসেছি তা ওরা টের পেয়ে যাবে। রাত্তিরে এখানে হামলা হতে পারে। চল, চল, পালাই। ওদের বোঝাতে হবে যে, আমরা ভয় পেয়েছি।"

হুড়োহুড়ি করে জামাকাপড় ব্যাগে ভরে নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলেন দু'জনে।

কাকাবাবু বললেন, "এ-যাত্রায় টর্চ আনিনি সঙ্গে, এটা একটা মস্ত ভুল হয়েছে। দেখিস জোজো, অন্ধকারে যেন হোঁচট খেয়ে পড়িস না।"

তিনটে ব্যাগই জোজোকে নিতে হয়েছে, কাকাবাবু হাঁটছেন ক্রাচ নিয়ে, এক হাতে রিভলভার। তীক্ষ্ণ নজরে দেখছেন, কেউ পেছনে আসছে কি না।

লাইনের ধারে মিনিট দশেক দাঁড়াবার পরই ট্রেনটা এসে গেল।

অধিকাংশ কামরাই ফাঁকা। জোজো আর কাকাবাবু যে কামরায় উঠলেন, সেটাতে আর একজনও যাত্রী নেই। তবে আলো জ্বলছে।

কাকাবাবু বললেন, "টিকিট কাটা হল না.... চেকার এলে ভাড়া মিটিয়ে দিলেই হবে।"

জোজো বলল, "সন্তু যেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেছে, সেই জায়গাটা আমি দেখিয়ে দিতে পারব।"

কাকাবাবু বললেন, "দেখলেও বিশেষ লাভ হবে না। এখানে শুধু পাহাড়ের পর পাহাড়। এর মধ্যে কোনও মানুষ লুকিয়ে থাকলে খুঁজে বার করা অসম্ভব !"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, এই দু'দিন আপনি কোথায় ছিলেন ?"

কাকাবাবু বললেন, "সে খুব রোমহর্ষক কাহিনী। এত ঝঞ্ঝাটে আমিও আগে কখনও পড়িনি।"

সংক্ষেপে তিনি জোজোকে ব্যাপারটা জানালেন।

অন্ধকারে পাহাড়ি রাস্তায় গাড়ি চালাতে-চালাতে কাকাবাবু কোথায় যে চলে গিয়েছিলেন তার ঠিক নেই। পাহাড় ছেড়ে নীচে নামার রাস্তা কিছুতেই খুঁজে পাননি। দু-একবার গাড়ি অ্যাক্সিডেন্ট হতে যাচ্ছিল। একবার তো খাদে পড়ে

যাচ্ছিলেন প্রায়।

তারপর হঠাৎ গাড়িটা বন্ধ হয়ে গেল এক জায়গায়। আর কিছুতেই স্টার্ট নেয় না। কাকাবাবু দেখলেন গাড়িতে আর এক ফোঁটাও পেট্রল নেই। রাত তখন তিনটে।

তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, গাড়িতে বসে থাকা আরও বিপজ্জনক। মঞ্চাম্মা নামে সেই মহিলা আর তার দলবল তাঁকে ধরার জন্য ধাওয়া করে আসবেই।

তিনি গাড়ি ছেড়ে, কোনওরকমে হ্যাঁচোড়-প্যাঁচোড় করে রাস্তা থেকে উঠে গেলেন খানিকটা ওপরে। একটা বড় পাথরের আড়ালে বসে রইলেন। এখানে তাঁকে কেউ দেখতে পাবে না। খোঁজাখুঁজির জন্য ওরা ওপরে উঠে এলেও তিনি পাথরের আড়াল থেকে গুলি চালাতে পারবেন।

ভোরের আলো ফোটার একটু পরেই আর-একটা গাড়ি চলে এল সেখানে। তার থেকে তিনজন লোক আর সেই মঞ্চাম্মা নামের মহিলাটা নামল। পরিত্যক্ত জিপটায় উঁকিঝুঁকি মেরে তারা তাকাল পাহাড়ের দিকে। খানিকটা কাছাকাছি খোঁজাখুঁজি করল। কাকাবাবু ওপর থেকে ওদের দেখতে পাচ্ছেন, ওরা তাঁকে দেখতে পাচ্ছে না।

তারপর নিজেদের গাড়ির সঙ্গে অন্য জিপটাকে বেঁধে নিয়ে ওরা চলে গেল।

কাকাবাবু তখনও বুঝতে পারছেন না, তিনি কোনদিকে গেলে আরাকু ভ্যালি পৌঁছবেন। ম্যাপটা হারিয়ে গেছে। তবু ভাগ্যিস জিপটার মধ্যে তাঁর ক্রাচদুটো পাওয়া গিয়েছিল।

রাস্তাটা যেদিকে ঢালু হয়ে গেছে, সেদিকে খানিকটা এগিয়েও লাভ হল না। হঠাৎ সেটা খাড়া হয়ে আবার উঠে গেছে ওপরের দিকে।

খানিক পরে আর একটা গাড়ির আওয়াজ পেতেই তিনি সতর্ক হয়ে গেলেন। অন্য কারও গাড়ি হলে তিনি লিফ্‌ট চাইতে পারেন, কিন্তু যদি গুন্ডাদেরই গাড়ি হয়?

সাবধানের মার নেই। কাকাবাবু আবার রাস্তা ছেড়ে ওপরের দিকে উঠে একটা পাথরের আড়াল খুঁজলেন। যা ভেবেছিলেন ঠিক তাই। দু'দিক থেকে দুটো গাড়ি এল, দুটোই গুন্ডাদলের। তারা পাগলের মতো কাকাবাবুকে খুঁজছে। কিছুতেই যেন তাঁকে বেঁচে ফিরতে দেবে না।

কাকাবাবু বুঝতে পারলেন, পাকা রাস্তা দিয়ে তাঁর হাঁটা চলবে না। যে-কোনও সময় একটা বাঁকের আড়াল থেকে ওদের গাড়ি এসে পড়তে পারে, তখন গা-ঢাকা দেবেন কী করে?

তাঁকে এগোতে হবে রাস্তা ছেড়ে ওপরের ঝোপঝাড় ঠেলে। দু' বগলে ক্রাচ নিয়ে সেভাবে চলা কি সহজ কথা? এক ঘণ্টা হেঁটেই ক্লান্ত হয়ে যান।

সারাদিন ধরে ওদের দলের সঙ্গে কাকাবাবুর লুকোচুরি খেলা চলল।

অন্ধকার নেমে আসার পর তিনি আর এক-পাও এগোতে সাহস করলেন না। যে-কোনও মুহূর্তে খাদে পড়ে যাওয়ার আশঙ্কা। শরীরও আর বইছিল না। প্রায় দু'দিন কিছু খাওয়া হয়নি। মাঝে-মাঝে গর্তে জমে থাকা বৃষ্টির জল পান করতে বাধ্য হয়েছেন। খাদ্য জুটবে কোথায়? পাহাড়ের কোনও গাছেই ফল নেই, গাছের পাতা তো খাওয়া যায় না!

সারারাত তিনি একটা বড় গাছের তলায় ঘুমোলেন।

পরদিন কিছুটা ঘোরাঘুরি করার পর তিনি দেখতে পেলেন একটা ছোট্ট ঝরনা। সেটা দেখে তিনি অনেকটা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন। ঝরনার জল নিশ্চিন্তে পান করা যাবে, তা ছাড়া ঝরনা সবসময় নীচের দিকে যায়। অনেক ঝরনা মিলে সমতলে গিয়ে নদী হয়। ঝরনাটাকে অনুসরণ করতে পারলে সমতলে গিয়ে পৌঁছবেন।

ঝরনায় নেমে তিনি ছপছপ করে এগোচ্ছিলেন। তবু একটা মুশকিল হল। মাঝে-মাঝে সেই ঝরনাটা বয়ে যাচ্ছে একেবারে রাস্তার পাশ দিয়ে। রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে দু-একটা গাড়ি। সে-গাড়ি ওই গুন্ডাদের, না অন্যদের, তা বুঝবার উপায় নেই, ঝুঁকিও নেওয়া যায় না। ওরা এখনও খুঁজছে, হাল ছাড়েনি, তাই দূরে গাড়ির আওয়াজ পেলেই কাকাবাবুকে লুকোতে হয়েছে।

শেষপর্যন্ত সমতলে পৌঁছে, একটা ট্রাক ধরে তিনি কাকুতি-মিনতি করেছেন। সেই ট্রাকটা ছিল কাঠবোঝাই, তারা একজন খোঁড়া মানুষকে দেখে দয়া করে নামিয়ে দিয়ে গেছে গেস্ট হাউসের কাছে।

কাকাবাবু বললেন, "জানিস জোজো, একবার ওরা আমাকে প্রায় ধরে ফেলেছিল। ঝরনাটার পাশ দিয়ে যাচ্ছি, এক জায়গায় দেখি, ওদের তিনজন গাড়ি থামিয়ে রাস্তায় নেমে কীসব শলাপরামর্শ করছে। আমি চট করে লুকিয়ে পড়লাম। ওরা যতক্ষণ না চলে যায়, ততক্ষণ অপেক্ষা করতে হল। কিন্তু ইচ্ছে করলেই আমি আড়াল থেকে গুলি চালিয়ে ওদের জখম করে গাড়িটার দখল নিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু নেহাত প্রাণরক্ষার জন্য শেষ মুহূর্তে ছাড়া মানুষের ওপর গুলি চালাতে ইচ্ছে করে না। তাই এত কষ্ট পেয়েও আমি ওদের ছেড়ে দিয়েছি।"

জোজো বলল, "মূর্তি-চোরগুলো এত মরিয়া হয়ে উঠেছে, ওই মূর্তিগুলো খুব দামি বুঝি?"

কাকাবাবু বললেন, "তা জানি না। আমি তো ভাল করে দেখিইনি। প্রোফেসর ভার্গব বলেছিলেন, এই মূর্তিগুলোর ইতিহাসের দিক থেকে খুব দাম আছে, কিন্তু বাজারে বিক্রি করলে বা বিদেশে বিক্রি করলে কত দাম পাওয়া যাবে, সে সম্পর্কে কিছু শুনিনি। এবারে গিয়ে ওঁকে জিজ্ঞেস করতে হবে।"

কাকাবাবু একটা হাই তুলে বললেন, "এবারে বড্ড পরিশ্রম গেছে রে! দু' রাত্তির ঠিকমতন ঘুমোতে পারিনি। খুব ক্লান্ত লাগছে।"

জোজো বলল, “এত জায়গা, আপনি শুয়ে পড়ুন না !”

কাকাবাবু বললেন, “আমরা ঝটপট চলে এসেছি। ওরা বোধ হয় আমাদের ট্রেনে ওঠাটা টের পায়নি। তবু সাবধানে থাকতে হবে। আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি, তুই পাহারা দিতে পারবি ?”

জোজো বললে, “কেন পারব না ? আপনি নিশ্চিন্তে ঘুমোন।”

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, “আমার রিভলভারটা যদি তোর কাছে রাখি, দরকার হলে তুই গুলি চালাতে পারবি তো ?”

জোজো ঠোঁট উলটে বলল, “ইজি ! একবার সাহারা মরুভূমিতে তিন-তিনটে বেদুইন-ডাকাত আমাদের ঘিরে ফেলেছিল। আমাদের সঙ্গে যে আর্মড গার্ড ছিল, সে বেচারা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেছে। আমি তার হোলস্টার থেকে টপ করে রিভলভারটা তুলে নিয়ে চোখের নিমেষে গুলি চালালুম। তিনটে ডাকাতই ঘায়েল।”

কাকাবাবু হা-হা করে হেসে উঠে বললেন, “বাঃ, এই তো ঠিক জোজোর মতন কথা। এতক্ষণ বড্ড চুপচাপ ছিলি। তোর মুখে এইরকম কথা শুনতেই আমার ভাল লাগে।”

॥ ৮ ॥

ভাইজাগে ট্রেনটা পৌঁছল মাঝরাতের পর।

একটা ট্যাক্সি নিয়ে কাকাবাবু ‘পার্ক হোটেল’-এর দিকে গেলেন না। ‘হংসরাজ’ নামে আর একটা ছোটখাটো হোটেলে উঠলেন, দুটো ঘর ভাড়া নিলেন। দুটো ঘরের মাঝখান দিয়ে একটা দরজা রয়েছে।

কাকাবাবু জোজোকে বললেন, “এখানে দুটো খাট রয়েছে, তুই ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে এ-ঘরে শুতে পারিস। পাশের ঘরেও থাকতে পারিস। কাল সন্ধের আগে আমাদের কোনও কাজ নেই। আমি স্রেফ ঘুমোব। কাল সন্ধের আগে তুই ঘর থেকে এক-পাও বেরুবি না। ফোন করে ঘরে খাবার আনাবি। তোর যখন ইচ্ছে খাবি, আমার জন্য অপেক্ষা করবি না।”

তারপর সত্যিই কাকাবাবু পরদিন অনেক বেলা পর্যন্ত ঘুমোলেন। তারপর ব্রেকফাস্ট খেয়ে, স্নানটান করে আবার শুতে গেলেন। দুপুরবেলা জোজো একবার ডাকল, তবু তিনি চোখ না মেলেই বললেন, “আমি লাঞ্চ খাব না, তুই খেয়ে নে।”

বিকেলবেলায় উঠে বসে চা-বিস্কুট খেলেন।

জোজোকে বললেন, “প্যান্ট-শার্ট পরে নে, আমরা এখন বেরুব। শোন জোজো, এর পর তোকে আমি যা-যা করতে বলব, তুই চটপট করে যাবি। কোনও প্রশ্ন করবি না। মনে থাকবে ?”

জোজো মাথা নাড়ল।

কাকাবাবু নিজেও তৈরি হয়ে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন।

হোটেলের সামনে একটুক্ষণ অপেক্ষা করার পর একটা ট্যাক্সি পাওয়া গেল। কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "আগে একটা বাজারে চলো।"

ট্যাক্সিটা শহরের মাঝখানে একটা বাজারের কাছে এসে থামল। কাকাবাবু নিজের মানিব্যাগটা জোজোকে দিয়ে বললেন, "তুই ভেতরে গিয়ে খুঁজে তিন-চারটে নাইলনের দড়ি আর তিন-চারটে গামছা কিনে নিয়ে আয়। চারটে করেই আনিস।"

কাকাবাবু গাড়িতেই অপেক্ষা করতে লাগলেন।

একটু পরে জোজো জিনিসগুলো কিনে আনার পর কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "সমুদ্রের ধারে চলো!"

একটু-একটু বৃষ্টি পড়ছে, রাস্তা ফাঁকা। সন্ধে হয়ে গেছে। বেলাভূমি অনেকটা পার হওয়ার পর কাকাবাবু ডান দিকে বেঁকতে বললেন। তারপর একটু এদিক-ওদিক ঘুরে একটা মাঠের ধারে থামতে বললেন।

ড্রাইভারকে বললেন, "এখানে একটু অপেক্ষা করুন, আমাদের বেশিক্ষণ লাগবে না।"

জোজোকে বললেন, "জিনিসগুলো নিয়ে আয় আমার সঙ্গে।"

সেই মাঠের মধ্যে একটি মেয়েদের হস্টেল। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে দরোয়ান। বৃষ্টির জন্য সে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বিড়ি খাচ্ছে, বন্দুকটা পাশে নামানো।

কাকাবাবুরা কাছে আসতেই সে জিজ্ঞেস করল, "কী চাই?"

কাকাবাবু বললেন, "সুপারিনটেনডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে চাই।"

দরোয়ানটি রুক্ষভাবে বলল, "এখন হবে না।"

কাকাবাবু মিনতি করে বললেন, "আমার বিশেষ দরকার। পাঁচ মিনিটের জন্য।"

দরোয়ানটি বলল, "বলছি তো হবে না। ছ'টার মধ্যে আসতে হবে।"

কাকাবাবু ফস করে রিভলভার বের করে বললেন, "মাথার ওপর হাত তোলো, ভেতরে চলো, একটু চেঁচালে মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।"

ভয়ে লোকটার চোখ কপালে উঠে গেল, কাকাবাবু তাকে প্রায় ঠেলে নিয়ে চললেন। ভেতরের একটা প্যাসেজে ঢোকার পর কাকাবাবু বললেন, "জোজো, গামছা দিয়ে এর মুখ বেঁধে ফেল, তারপর হাত আর পা বেঁধে দে।"

দরোয়ানটিকে দাবড়ানি দিলেন, "একটুও নড়বে না।"

জোজো চটপট ওকে বেঁধে ফেলল। সে আস্তে-আস্তে বসে পড়ল মাটিতে।

ভেতরে একটা বেশ বড় উঠোন। তার একপাশে সুপারিনটেনডেন্টের

অফিসঘর। তিনি একজন মাঝবয়সী মহিলা, তাঁর চেয়ে কিছু কমবয়সী এক মহিলা তাঁর সহকর্মী, দু'জনেই কাকাবাবু ও জোজোকে দেখে মুখ তুলে তাকালেন।

বয়স্কা মহিলাটি বললেন, "কী চাই? কে আপনাদের ভেতরে আসতে দিয়েছে?"

কাকাবাবু রিভলভারটা তুলে বললেন, "এটার জোরে ঢুকেছি। এটা কী জানেন তো?"

জোজো বলল, "রোজ দুপুরে হিন্দি সিনেমা দেখায় টিভিতে। রিভলভার কী, তা সব মেয়েও জানে। সব হিন্দি সিনেমায় থাকে।"

কাকাবাবু বললেন, "তোকে এত কথা বলতে হবে না। তুই দরোয়ানের বন্দুকটা নিয়ে এসে দাঁড়া। আর কোনও দরোয়ান বা গার্ড দেখলে সোজা গুলি করবি।"

মহিলা দু'জনের দিকে তাকিয়ে বললেন, "চেঁচাবেন না, মুখ খুললেই সোজা গুলি চালাব। আমার কথা লক্ষ্মী মেয়ের মতন শুনলে কোনও ক্ষতি করব না। মাথার ওপর হাত তুলে ঘর থেকে বেরিয়ে আসুন। দু'জনেই।"

ওই একটি দরোয়ান ছাড়া এই হস্টেলে আর কোনও পুরুষকর্মী নেই। উঠোনের একপাশে ঝুলছে একটা লোহার ঘণ্টা।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "এখানে সবসুদ্ধ ক'জন মেয়ে আছে?"

বড় দিদিমণি বললেন, "এখন আছে বিয়াল্লিশজন।"

কাকাবাবু বললেন, "সবাইকে নীচে ডাকুন। এই ঘণ্টা বাজালে সবাই নেমে আসবে? বাজিয়ে দিন!"

ছোট দিদিমণিটি খুব জোরে-জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে দিল।

হুড়মুড় করে নেমে এল মেয়েরা। পাহাড়ি নদীর ঢলের মতন। কলকল-কলকল শব্দ করে। সকলে একই রকম ফ্রক পরা, একই বয়সী, প্রায় একই রকম চেহারা।

কাকাবাবু একটা থামের আড়ালে গা-ঢাকা দিয়ে বড় দিদিমণিকে বললেন, "সবাইকে সার বেঁধে পাশাপাশি দাঁড়াতে বলুন।"

মেয়েরা সকলেই একসঙ্গে কথা বলছে, হাসছে, গোলমাল করছে। বড় দিদিমণির কথা তারা শুনতেই পাচ্ছে না। তিনি বারবার বললেন, "লাইন করে দাঁড়াও।" কয়েকটি মেয়ে চেঁচিয়ে বলছে, "কেন, কেন, কী হয়েছে, কী হয়েছে?"

কাকাবাবু আড়াল থেকে সামনে এসে রিভলভারটা ওপরে তুলে একবার ফায়ার করলেন।

মেয়েরা ভয়ে শিউরে উঠে আঁ-আঁ করে উঠল।

জোজো বন্দুকটা তুলে বলল, "চুপ, সবাই চুপ।"

সঙ্গে-সঙ্গে সব কলকলানি থেমে গেল। মেয়েরা কেউ কিছু বুঝতে পারছে না ব্যাপারটা। চোখ বড়-বড় করে তাকিয়ে রইল।

কাকাবাবু বললেন, "রাধা গোমেজ কার নাম ? সামনে এগিয়ে এসো।"

রাধা দু'পা এগিয়ে দারুণ বিস্ময়ের সঙ্গে বাংলায় বলল, "আপনি ? কাকাবাবু, আপনি..."

কাকাবাবু এক ধমক দিয়ে বললেন, "চুপ ! একটাও কথা বলবে না।"

জোজোকে বললেন, "ওই মেয়েটার মুখটা বেঁধে ফেল। হাত ধরে টেনে নিয়ে আয়।"

কাকাবাবু বড় দিদিমণির ঘাড়ে রিভলভার ঠেকিয়ে বললেন, "আমরা শুধু এই একটি মেয়েকে নিয়ে যাচ্ছি। কারও কোনও ক্ষতি করব না। আমরা চলে যাওয়ার পর দশ মিনিট পর্যন্ত কেউ নড়বে না। আমার কথার অবাধ্য হলে বোমা দিয়ে পুরো বাড়িটা উড়িয়ে দেব।"

জোজো টানতে-টানতে মুখবাঁধা অবস্থায় নিয়ে এল রাধাকে।

বাড়ি থেকে বেরিয়ে দরজাটা টেনে বন্ধ করে হুড়কো লাগিয়ে দিলেন কাকাবাবু। তারপর গেট পেরিয়ে মাঠের মধ্য দিয়ে দ্রুত এগোতে-এগোতে বললেন, "জোজো, এবার ওর মুখের বাঁধনটা খুলে দে। ট্যাক্সি ড্রাইভার যেন কিছু সন্দেহ না করে। বেশ সহজেই কাজটা হয়ে গেল।"

গামছাটা খোলা হতেই রাধা অভিমানের সঙ্গে বলল, "কাকাবাবু আপনি ডাকলেই তো আমি চলে আসতাম। আমার মুখ বাঁধতে বললেন কেন ?"

কাকাবাবু হেসে ফেলে বললেন, "বেশ একটা নাটক হল, না ? সবাই দেখল একটা খোঁড়া লোক, কিন্তু দারুণ হিংস্র, কথায়-কথায় গুলি চালাতে পারে, সে একটা ফুটফুটে মেয়েকে জোর করে লুঠ করে নিয়ে গেল। পুলিশের কাছে বর্ণনা দিতে ওদের অসুবিধে হবে না। আমি এটাই চেয়েছিলাম।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কাকাবাবু, আমার সম্পর্কে ওরা কিছু বলবে না ?"

কাকাবাবু বললেন, "সব মেয়েই তোর সম্পর্কে বলবে, একটা বেশ সুন্দর মতন ছেলে সঙ্গে ছিল, খুব স্মার্ট। আমরা দু'জনে মিলে একটা ডাকাতের টিম।"

ট্যাক্সিতে উঠে তিনি বললেন, "হোটেলে ফিরে চলো।"

ট্যাক্সিতে কাকাবাবু ওদের চুপ করে থাকার ইঙ্গিত করলেন। হোটেলের ঘরে এসে তিনি বললেন, "রাধা, তোমাকে কেন ধরে এনেছি সেটা তোমার জানা উচিত। তার আগে বলো, মঞ্চাম্মা কি তোমার নতুন মায়ের নাম ?"

রাধা বলল, "হ্যাঁ। দলের সব লোক বলে মঞ্চাম্মা। বাবা বলেন মঞ্চি। নতুন মা কী করেছে ?"

কাকাবাবু বললেন, "আমার ওপর তার খুব রাগ, কেন জানি না। আমাকে প্রায় খতম করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। পারেনি।"

রাধা বলল, "আমি বলেছিলাম না? আমি আপনাকে সাবধান করে দিয়েছিলাম।"

কাকাবাবু বললেন, "তুমি বলেছিলে ওদের স্মাগলিংয়ের কারবার। কিন্তু এর মধ্যে যে ওরা আবার মূর্তি চুরি করার কারবারে লেগে পড়েছে, তা জানব কী করে?

রাধা জোজোর দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, "তুমি সন্তুদাদা?"

কাকাবাবু বললেন, "না, ও সন্তুর বন্ধু জোজো।"

রাধা বলল, "ও হ্যাঁ, হ্যাঁ জোজোকে চিনি। জোজোর কথাও জানি।"

কাকাবাবু বললেন, "সন্তুকে কারা যেন ধরে নিয়ে গেছে। সম্ভবত তোমার বাবা-মায়েরই দলের লোক। সেইজন্য তোমাকে আমি জামিন হিসেবে রেখে দিলাম। কিছুক্ষণের মধ্যেই এ-খবর ওদের কাছে পৌঁছে যাবে। তোমাকে আমি যতক্ষণ ধরে রাখব, ততক্ষণ ওরা সন্তুর কোনও ক্ষতি করতে পারবে না!"

রাধা জিজ্ঞেস করল, "সন্তুদাদাকে কি আমাদের বাড়িতে নিয়ে গেছে? তা হলে আমি সে-বাড়ি চিনিয়ে দিতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "সেটা ওরাও বুঝবে। তোমাকে ধরে আমি বাড়িতে পৌঁছে যেতে পারি, সেইজন্য ওখানে সন্তুকে রাখবে না। ওখানে কোনও প্রমাণও রাখবে না।"

জোজো বলল, "আমার মনে হয়, আরাকু পাহাড়ের ওখানেই কোথাও সন্তুকে লুকিয়ে রেখেছে।"

কাকাবাবু বললেন, "সে এলাকায় আমি দু'দিন কাটিয়েছি। আমাদের পক্ষে সেখান থেকে সন্তুকে বার করা অসম্ভব! পুলিশও পারবে না। রাধা, রাত জাগলে তোমার কষ্ট হয়?"

রাধা বলল, "না, ইচ্ছে করলে আমি রাত জাগতে পারি।"

কাকাবাবু বললেন, "আজ সহজে ঘুমোবার আশা নেই। এখন পাশের ঘরটায় গিয়ে তুমি জোজোর সঙ্গে গল্প করতে পারো। একটু বাদে আমরা কিছু খেয়ে নেব। রাত বারোটার পর আমরা বেরোব।"

জোজো জিজ্ঞেস করল, "কোথায় যাব?"

কাকাবাবু বললেন, "বেড়াতে।"

রাধা আর জোজো দু'জনেই একসঙ্গে বলে উঠল, "বেড়াতে?"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "বেশি রাতেই তো বেড়াতে ভাল লাগে। তখন আমরা সমুদ্র দেখব। গান গাইতেও পারি। রাধা, তুমি গান জানো?

রাধা বলল, "না। আমি পিয়ানো শিখছি।"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো বেশ ভাল গান গায়। আমরা জোজোর গান শুনব। এখন বরং একটু বিশ্রাম করে নাও।"

রাধা আর জোজো দু'জনেই উত্তেজনায় ছটফট করছে। কাকাবাবু এমন ভাব দেখাচ্ছেন, যেন কিছুই হয়নি। চেয়ারে বসে পা দুটো লম্বা করে ছড়িয়ে দিয়ে মাথাটা হেলিয়ে দিলেন।

রাধা আর জোজো চলে গেল পাশের ঘরে।

একটু পরে কাকাবাবু টেলিফোনের ডায়াল ঘোরালেন। দু-তিনবারের চেষ্টায় পাওয়া গেল রাজমহেন্দ্রীকে। হালকা গলায় তিনি বললেন, "হ্যালো, রাজমহেন্দ্রী, খবর কী ? খানিকটা বৃষ্টি পড়ে আজ হাওয়াটা বেশ ঠাণ্ডা হয়ে গেছে, তাই না ?"

রাজমহেন্দ্রী দারুণ ব্যস্ত হয়ে বললেন, "মিঃ রায়চৌধুরী, আপনি কোথায় ? দু'দিন ধরে আপনার কোনও সন্ধানই পাওয়া যাচ্ছে না। আরাকু ভ্যালির ও. সি. কিছু বলতে পারছে না। এদিকে দিল্লি থেকে আপনার খোঁজ করা হচ্ছে, দু-তিনটে মেসেজ এসেছে। আপনাকে খুঁজে বার করার জন্য আমরা একটু বাদে পুলিশ বাহিনী পাঠাচ্ছিলাম।"

কাকাবাবু ওসব কথার পাত্তাই না দিয়ে বললেন, "আজ সন্ধেবেলা মেয়েদের হস্টেল থেকে কারা যেন একটি কিশোরী মেয়েকে রিভলভার দেখিয়ে লুঠ করে নিয়ে গেছে, সে-খবরটা শোনেননি ?"

রাজমহেন্দ্রী খানিকটা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, মানে সেই খবর তো একটু আগেই রেডিয়োতে বলল, আপনারই মতন ডেসক্রিপশানের একজন লোক, সঙ্গে একটি অল্পবয়সী ছেলে, সন্ধের পর মেয়েদের হস্টেলে ঢুকে...একটা মেয়েকে গাপ করা হয়েছে...আপনি সে-কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন ? ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারছি না।"

কাকাবাবু বললেন, "বুঝবেন, বুঝবেন, আস্তে-আস্তে বুঝবেন। মেয়েটিকে যে গাপ করা হল, পুলিশ খোঁজাখুঁজি করবে নিশ্চয় !"

রাজমহেন্দ্রী বললেন, "বাঃ, খুঁজবে না ? এটা পুলিশের ডিউটি !"

কাকাবাবু একটু হেসে বললেন, "তা তো বটেই। কিন্তু আপনাদের পুলিশ কতটা ডিউটিফুল ? আজ রাত থেকেই খোঁজাখুঁজি শুরু করবে ?"

রাজমহেন্দ্রী অসহিষ্ণুভাবে বললেন, "মিস্টার রায়চৌধুরী, আপনি কী বলতে চাইছেন, বুঝতে পারছি না !"

কাকাবাবু বললেন, "আপনার পুলিশদের বলুন, ব্যস্ত হওয়ার কিছু নেই, সে-মেয়েটি ভাল আছে, নিরাপদে আছে। কালকেই ফিরে যাবে।"

রাজমহেন্দ্রী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কোথায় আছেন ? দিল্লি থেকে আপনার সঙ্গে যোগাযোগ করতে চাইছে—"

কাকাবাবু তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "কাল সকালে, কাল সকালে অন্য কথা হবে। আমিই আবার ফোন করব।"

রাজমহেন্দ্রীকে আর কিছু বলতে না দিয়ে তিনি ফোন রেখে দিলেন।

রাত বারোটার সময় তিনি বললেন, "জোজো, রাধা, এবার চলো বেরুনো যাক।"

বাইরে এসে বললেন, "চমৎকার ফুরফুরে হাওয়া দিচ্ছে, ট্যাক্সি নিয়ে কী হবে, চলো আমরা হেঁটেই যাই।"

সন্ধেবেলা একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখন আকাশ ঝকঝকে পরিষ্কার। এত রাতে রাস্তায় মানুষজন প্রায় নেই। দু-একটা গাড়ি যাচ্ছে মাঝে-মাঝে।

একটা ঢালু রাস্তা দিয়ে সমুদ্রের দিকে নামতে-নামতে কাকাবাবু বললেন, "রাধা, তুমি সব সময় আমার পাশে-পাশে থাকবে, একটুও দূরে চলে যেয়ো না, কেমন?"

জোজো বলল, "কাকাবাবু, রাধাকে ছেলে সাজিয়ে আনলে ভাল হত না? তা হলে ওকে কেউ চিনতে পারত না। আমার শার্ট-প্যান্ট ওকে ফিট করে যেত।"

রাধা বলল, "আমাদের ইস্কুলের থিয়েটারে আমি পুরুষের পার্ট করেছি। গোঁফ লাগিয়ে দিয়েছিল। আমার বাবাও প্রথমে বুঝতে পারেননি।"

কাকাবাবু মুচকি-মুচকি হাসতে লাগলেন।

সমুদ্রের ধারটা একেবারেই নির্জন। সন্ধের সময় বেশ ভিড় থাকে, অনেক ফেরিওয়ালা ঘোরে, এখন কেউ নেই।

মাঝে-মাঝেই বাঁধানো বসবার জায়গা। একটা জায়গা বেছে নিয়ে কাকাবাবু বসলেন, মাঝখানে রাধা। কাকাবাবু পাজামা-পাঞ্জাবির ওপর একটা চাদর জড়িয়ে এসেছেন। রাধাকে বললেন, "তোমার শীত করলে আমার চাদরটা নিতে পারো।"

এখন ঢেউয়ের শব্দ বেশ জোর। দূরে ডলফিন্স নোজ পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে অস্পষ্টভাবে। তার ওপারে লাইট হাউসের আলো ঘুরে-ঘুরে যাচ্ছে। বাঁ দিকে, দূরের পার্ক হোটেলের পাশেও আর একটা লাইট হাউস। আজ অবশ্য সমুদ্রে কোনও জাহাজ দেখা যাচ্ছে না।

রাধা বলল, "আমাদের শহরটা খুব সুন্দর, না? একসঙ্গে পাহাড় আর সমুদ্র। জোজো, তুমি এরকম আর কোনও শহর দেখেছ?"

জোজো বলল, "কত দেখেছি! ইতালির ক্যাপ্রিতে। একবার মেক্সিকোতে পাহাড় থেকে সমুদ্রে ডাইভ দিলাম, জলের তলায় একটা প্রবাল দ্বীপ।"

কাকাবাবু বললেন, "ওসব গল্প এখন থাক। গান হোক। জোজো, তুই এই গানটা জানিস, 'যাবই, আমি, বাণিজ্যেতে যাবই...' "

জোজো বলল, "খানিকটা জানি, সব কথা মনে নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, 'নীলের কোলে শ্যামল সে দ্বীপ প্রবাল দিয়ে ঘেরা। শৈলচূড়ায় নীড় বেঁধেছে সাগর বিহঙ্গেরা...।" '

জোজোর গানের গলাটি বেশ ভাল। সে পরপর গান গেয়ে যেতে লাগল।

রাধা গান জানে না বলেছিল, সেও মোটামুটি ইংরেজি গান গাইতে পারে।

কাকাবাবু বললেন, "আমিও কয়েকটা ইংরেজি গান জানি। শুনবে? '...মাই হার্ট ইজ ডাউন, মাই হেড ইজ টার্নিং অ্যারাউন্ড, আই হ্যাড টু লিভ আ লিট্‌ল গার্ল ইন কিংস্টন টাউন...।' একজন লোক তার ছোট মেয়েকে রেখে অনেক দূরে চলে যাচ্ছে।"

গান থামিয়ে কাকাবাবু বললেন, "আচ্ছা রাধা, এখন তোমার বাবা এসে পড়ে যদি বলেন, রাধা, উঠে এসো। আমার কাছে চলে এসো! তখন তুমি কী করবে?"

রাধা চট করে কোনও উত্তর দিতে পারল না।

জোজো বলল, "আমি তো শুনলুম, ওর বাবা—"

কাকাবাবু তাকে বাধা দিয়ে বললেন, "তুই এখন চুপ কর। ওকে ভেবেচিন্তে বলতে দে।"

রাধা খানিকটা দ্বিধার সঙ্গে বলল, "আমার বাবা, আর যাই হোক, আমাকে ভালবাসে। বিশ্বাস করুন।"

কাকাবাবু বললেন, "কেন বিশ্বাস করব না? বাবা মেয়েকে ভালবাসবে, মেয়ে বাবাকে ভালবাসবে। এটাই তো স্বাভাবিক। বাবার কথাও তোমার শোনা উচিত। আমাকে তো তুমি দু'দিন মাত্র দেখেছ। কিন্তু আমিও তো সন্তুকে খুব ভালবাসি। যে-কোনও উপায়ে আমি সন্তুকে উদ্ধার করতে চাইব, তাই না?"

রাধা বলল, "সে তো নিশ্চয়ই!"

কাকাবাবু বললেন, "সুতরাং সন্তুকে ফেরত না পেলে আমি তোমাকে যেতে দেব না। তোমার বাবা এসে ডাকলেও আমি তোমাকে জোর করে ধরে রাখব। কিন্তু তোমার কোনও ক্ষতি হবে না। তুমি ভয় পেয়ো না যেন!"

রাধার চোখ ছলছল করে উঠল। ধরা গলায় সে বলল, "কাকাবাবু, আপনার পাশে থাকলে আমি মোটেই ভয় পাব না!"

কাকাবাবু বললেন, "জোজো, তোকেও কিন্তু ঘাবড়ালে চলবে না।"

মানুষজন নেই, তবে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাচ্ছে মাঝে-মাঝে। দু-একটা ট্যাক্সি। রাস্তার দিকে পেছন ফিরে বসে আছে ওরা। জোজো আবার গান ধরল।

আরও ঘণ্টাখানেক কেটে যাওয়ার পর একটা গাড়ি খুব জোরে ব্রেক কষে থামল।

মুখ না ফিরিয়েই কাকাবাবু বললেন, "এসে গেছে মনে হচ্ছে। ঠিক যা ভেবেছিলাম!"

জোজো চট করে দেখে নিয়ে সভয়ে বলল, "কাকাবাবু, ওরা পাঁচজন!"

কাকাবাবু এবার ধীরেসুস্থে রাস্তার দিকে ফিরলেন। গাড়ি থেকে পাঁচজন

নেমে ছড়িয়ে পড়েছে। দু'পাশে দু'জনের হাতে রিভলভার। মাঝখানে একজন রিভলভার হাতে এগিয়ে আসছে।

কাকাবাবু বললেন, "ঠিক হিন্দি সিনেমার মতন, তাই না!"

জোজো বলল, "ইংরেজি সিনেমার নকল।"

যে-লোকটি এগিয়ে আসছে, তার দিকে তাকিয়ে রাধা অস্ফুট স্বরে বলল, "বাবা!"

কাকাবাবু বললেন, "ইনিই তা হলে মিস্টার গোমেজ! নমস্কার। অস্ত্রশস্ত্রগুলো পকেটে ভরে রাখুন। তারপর আলোচনা করা যাক!"

গোমেজ চিবিয়ে-চিবিয়ে বলল, "মিস্টার রায়চৌধুরী। তোমার খেলা শেষ। একবার তুমি হাত ফসকে পালিয়েছ। এবার কোনও চালাকি করলে তোমায় গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেব।"

কাকাবাবু কাঁধ ঝাঁকিয়ে বললেন, "কতবার যে কতজন আমাকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেবে বলে শাসিয়েছে! একবারও কিন্তু কেউ পারেনি।"

গোমেজ বলল, "আগে তুমি কাদের পাল্লায় পড়েছ জানি না। এবার তুমি আর বাঁচবে না। রাধা, উঠে আয়!"

কাকাবাবু বললেন, "রাধা এখন যাবে না। আগে কথাবার্তা শেষ হোক!"

গোমেজ বলল, "কথা কীসের? মেয়েকে আগে ছাড়ো, নইলে তিন দিক থেকে গুলি চলবে। তোমার পালাবার কোনও রাস্তা নেই।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমার মেয়েকে ধরে রাখার ইচ্ছে আমার নেই। খুব ভাল মেয়ে, চমৎকার স্বভাব। ওকে ছেড়ে দিচ্ছি, তার আগে আমার ভাইপো সন্তুকে এনে দাও!"

গোমেজ বলল, "আমি কি এখানে দরাদরি করতে এসেছি নাকি? আমি ঠিক তিন গুনব, তার মধ্যে রাধাকে ছেড়ে না দিলে ওপাশের ছেলেটিকে প্রথমে মারব।"

কাকাবাবু এক ঝটকায় গায়ের চাদরটা সরিয়ে ফেললেন, দেখা গেল, তাঁর রিভলভার রাধার কানের কাছে ঠেকানো।

তিনি বললেন, "আমি কি ভ্যাবাগঙ্গারামের মতন তোমাদের হাতে ধরা দেওয়ার জন্য এখানে বসে আছি? আমি কি ঘাস খাই? টোপ ফেলে তোমাদের এখানে টেনে এনেছি। জানতাম, তোমরা ঠিক সন্ধান পাবে। মেয়েকে উদ্ধার করা তোমার কাছে সম্মানের প্রশ্ন। নিয়ে যাও মেয়েকে, তার আগে সন্তুকে এনে দাও। ব্যস, সব চুকে যাবে, আমি তোমাদের ব্যাপারে আর মাথা ঘামাব না!"

গোমেজ থমকে দাঁড়িয়ে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকাল।

কাকাবাবু বললেন, "আমার রিভলভারের সেফটি ল্যাচ খোলা। আমার মায়াদয়া নেই। তোমরা আর একটু এগোলে আমি গুলি চালাব, ওর মাথাটা

ছাতু হয়ে যাবে। মেয়েকে কোনওদিন ফেরত পাবে না। বেশিক্ষণ সময় নেই। পুলিশকে সব বলা আছে। তাজ হোটেলের সামনের গলিতে দু' গাড়ি পুলিশ অপেক্ষা করছে। আমাকে মারার চেষ্টা করলে তোমরাও পালাতে পারবে না। সন্তু কোথায় ?"

গোমেজ শুকনো গলায় বলল, "সে কোথায়, আমরা জানি না।"

কাকাবাবু বললেন, "তোমাদের লোকই তাকে ধরেছে। আমার ওপর তোমাদের রাগ। অন্য কেউ তাকে ধরতে যাবে কেন ?"

গোমেজ বলল, "আমাদের হাতে সে এখন নেই। সে পালিয়েছে।"

কাকাবাবু বললেন, "মিথ্যে কথা। তোমাকে বিশ্বাস করি না।"

রাধাকে উঠে দাঁড়াবার ইঙ্গিত করে তিনি বললেন, "শোনো গোমেজ, তোমাকে আমি ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময় দিচ্ছি। কাল ঠিক এই সময়ে, এইখানে সন্তুকে হাজির করবে, তখনই তোমার মেয়েও ফিরে যাবে তোমার কাছে। ঠিক চব্বিশ ঘণ্টা সময়।"

গোমেজের একজন সহকারী একটু এগোবার চেষ্টা করতেই কাকাবাবু প্রবল ধমক দিয়ে বললেন, "এবার আমি পাঁচ গুনব। তার মধ্যে তোমরা আমার রাস্তা ছেড়ে না দিলে এ-মেয়েটা মরবে, গুলির শব্দ পেলেই পুলিশের গাড়ি ছুটে আসবে। পেছন ফিরে তাকালেই পুলিশের গাড়ি দেখতে পাবে।"

গোমেজ হাত তুলে তার সঙ্গীদের থামার ইঙ্গিত করে বলল, "রাজা রায়চৌধুরী, আমার মেয়ের গায়ে যদি একটি আঁচড়ও লাগে, তা হলে তুমি পৃথিবীর যেখানে পালাও, তোমায় আমি ঠিক শেষ করব !"

কাকাবাবু বললেন, "তার আগে দেখো যেন আমার ভাইপো সন্তুর গায়েও একটি আঁচড়ও না লাগে ! আমার প্রতিশোধও অতি সাঙ্ঘাতিক। কাল এখানে সন্তুকে নিয়ে এসো, আমি তোমাদের জেন্টলম্যান্‌স ওয়ার্ড দিচ্ছি, রাধাকেও অক্ষতভাবে ফেরত পাবে।"

তিনি রাধার কানে রিভলভারটা ঠেকিয়ে রেখে এগোতে লাগলেন। গোমেজরা সরে গেল।

খানিকটা এগিয়ে তিনি বললেন, "জোজো, আমার একটা ক্রাচ পড়ে আছে, সেটা তুলে নিয়ে আয়। আলো জ্বেলে একটা কী গাড়ি আসছে দেখ তো, ট্যাক্সি নাকি ? হাত তুলে থামা।"

সেটা নয়, কিন্তু পরের গাড়িটা ট্যাক্সি। আগে জোজো আর রাধাকে তুলে দিয়ে কাকাবাবু পেছন ফিরে গোমেজকে বললেন, "আমাদের ফলো করার চেষ্টা কোরো না। কোনও লাভ নেই।"

ট্যাক্সিতে উঠে কাকাবাবু ড্রাইভারকে বললেন, "পিস্তল দেখে ঘাবড়িয়ো না ভাই। সিনেমার শুটিং হচ্ছে। তোমার গাড়িরও ছবি উঠে যাবে। এখন খুব জোরে চালাও তো !"

মাথা হেলান দিয়ে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "রাধা, ভয় পেয়েছিলে নাকি ?"

রাধা জোরে-জোরে দু'দিকে মাথা ঘুরিয়ে বলল, "না, একটুও না।"

জোজো বলল, "আপনি যখন বললেন, 'সেফ্‌টি ল্যাচ খোলা', তখন আমি একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম। যদি অ্যাক্‌সিডেন্ট হয়ে যেত ?"

কাকাবাবু রিভলভারটার মুখ জানলার বাইরে দিয়ে ট্রিগার টিপলেন। শুধু খট-খট শব্দ হল।

হাসতে-হাসতে তিনি বললেন, "আমি গুলি ভরিইনি ওইজন্য! সাবধানের মার নেই। রাধার গায়ে গুলি লাগবার ঝুঁকি কি আমি নিতে পারি ?"

জোজো বলল, "উরি সর্বনাশ! গুলিই ভরেননি! যদি ওদের সঙ্গে শেষপর্যন্ত ফাইট করতে হত ? আমি জানি, আপনি ইচ্ছে করলে ওদের তিনজনকেই আগে গুলি করতে পারতেন, অরণ্যদেবের মতন।"

কাকাবাবু বললেন, "অরণ্যদেব প্রত্যেকবার পারেন, আমি মাঝে-মাঝে ফসকে যাই। দরকার কী ওসব ঝঞ্ঝাটের। ওদের ভয় দেখিয়েই তো কাজ আদায় করা গেল।"

জোজো বলল, "পুলিশের গাড়ি কি সত্যি ছিল ? না কি সেটাও ওদের ভয় দেখালেন মিথ্যে কথা বলে ?"

কাকাবাবু হাসতে-হাসতে বললেন, "মাঝে-মাঝে ওরকম বলতে হয়। এটাকে বলতে পারিস সাইকোলজিক্যাল ওয়ারফেয়ার। ওদের মনের জোরের সঙ্গে আমার মনের জোরের যুদ্ধ। ক্রিমিন্যালদের সাধারণত মনের জোর কম হয়। ওরা আসলে ভিতু।"

ট্যাক্সিটাকে নানা রাস্তায় ঘুরিয়ে তারপর হোটেলের কাছে এনে ছেড়ে দিলেন। পেছনে কোনও গাড়ি আসেনি।

এত রাত্তিরেও হোটেলের লবিতে কাউন্টারে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে একজন লম্বা লোক। পুরোদস্তুর সুট-টাই পরা, মাথায় টুপি।

কাকাবাবুকে দেখে মাথা থেকে টুপিটা খুলে তিনি বললেন, "নমস্তে রাজা রায়চৌধুরী। এত রাতে কোথায় বেরিয়েছিলেন ?"

কাকাবাবু একটুও অবাক না হওয়ার ভান করে বললেন, "নরেন্দ্র ভার্মা যে! তুমি এত রাতে কোথা থেকে এলে ? আমরা তিনজনে একটু সমুদ্রের ধারে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কী চমৎকার হাওয়া!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "এত রাতে এই শহরে কেউ বেড়াতে যায় বলে শুনিনি। তা ছাড়া চতুর্দিকে তোমার সব বন্ধু ঘুরে বেড়াচ্ছে, তাদের কারুর সঙ্গে দেখা হল না ?"

কাকাবাবু বললেন, "নাঃ, কোনও বন্ধুর সঙ্গে তো দেখা হল না! এখানে এসে দেখা হল, তুমিই তো আমার একমাত্র বন্ধু!"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "রাজা, তোমার কী কাণ্ড বলো তো! আরাকু ভ্যালির

গেস্ট হাউসে তুমি নেই। এখানকার পার্ক হোটেলে তোমার জিনিসপত্র পড়ে আছে। সেখানেও ফেরোনি। অন্য হোটেলে উঠেছ, সে-কথা পুলিশকে জানিয়ে রাখবে তো ? আমরা খুঁজে-খুঁজে হয়রান !"

কাকাবাবু বললেন, "পুলিশকে জানাব ? তোমাকে বলেছিলাম না, সরষের মধ্যে ভূত থাকে অনেক সময় ? কেন, আমাকে এত খোঁজাখুঁজি করার কী আছে ? তোমারও তো বম্বে না কোথায় খুব কাজ ছিল, ফিরে এলে কেন ?"

নরেন্দ্র ভার্মা বললেন, "ফিরতে হল দিল্লির ঠেলা খেয়ে। রাজা, তোমার সঙ্গে খুব গুরুত্বপূর্ণ কথা আছে। এই ছেলেমেয়ে দুটিকে ওপরে পাঠিয়ে দাও।"

কাকাবাবু বললেন, "এত রাতে আবার কাজের কথা কীসের ? কাজের সময় কাজ, খেলার সময় খেলা, আর ঘুমের সময় ঘুম, এই না হলে স্বাস্থ্য খারাপ হয়ে যায়। তোমার জরুরি কথাটা চটপট সংক্ষেপে বলে ফেলো তো !"

নরেন্দ্র ভার্মা কাকাবাবুকে একপাশে টেনে নিয়ে ফিসফিস করে বললেন, "ভাইজাগের স্মাগলিং নিয়ে দিল্লি খুব চিন্তিত। প্রধানমন্ত্রী পর্যন্ত ব্যস্ত হয়ে গেছেন। এখান থেকে প্রচুর অস্ত্র, বিশেষত হাত-বোমা পাচার হচ্ছে শ্রীলঙ্কায়। এটা বন্ধ করতেই হবে, না হলে দু' দেশের সম্পর্ক আরও খারাপ হবে। সারা দেশের পুলিশকে অ্যালার্ট করে দেওয়া হয়েছে। দিল্লির কর্তারা তোমারও সাহায্য চান। তোমাকে সবরকম ক্ষমতা দেওয়া হবে। তুমি এখানকার চোরাচালান-বিরোধী অভিযানটা পরিচালনা করবে।"

কাকাবাবু কঠিন মুখ করে বললেন, "দেখো নরেন্দ্র, তুমি জানো না বোধ হয় যে, ওরা সন্তুকে ধরে রেখেছে। সন্তুর প্রাণের ঝুঁকি নিয়ে আমি কোনও কিছুই করতে পারব না। সন্তুকে উদ্ধার করা আমার প্রথম কাজ। তার আগে আমি স্মাগলিং-টাগলিং নিয়ে মাথা ঘামাতে চাই না। আমার পক্ষে অসম্ভব !"

॥ ৯ ॥

সন্তু কিছু বুঝবার আগেই অন্ধকারের মধ্যে কেউ একজন তার মুখ চেপে ধরল। আর একজন তার কাঁধ ধরে তুলে নিল সিট থেকে।

টানেলের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে ট্রেন। কিছুই দেখা যাচ্ছে না। সন্তু ছটফট করেও নিজেকে ছাড়াতে পারল না। টানেলটা শেষ হওয়ার একটু আগে লোক দুটো সন্তুকে নিয়ে ঝাঁপ দিল বাইরে।

ট্রেনের গতি এখানে বেশি নয়, ওদের তেমন লাগল না। ঝোঁক সামলে উঠে দাঁড়াবার আগেই একজন সন্তুর হাত দুটো পেছনে নিয়ে বেঁধে ফেলল। তারপর দুর্বোধ ভাষায় হুকুম দিল কী যেন।

সন্তু এখনও বিস্ময়ের ঘোর কাটিয়ে উঠতে পারেনি।

চলন্ত ট্রেন থেকে কেউ যে তাকে ধরে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করতে পারে, এরকম সে কল্পনাও করেনি একবারও। জোজো বারবার স্পাই-স্পাই করছিল বটে, ওটা তো জোজোর বাতিক। সব জায়গাতেই ও স্পাই দেখে।

এখানে সন্তু আর জোজোকে কে চেনে? ওদের পেছনে স্পাই লাগবে কেন?

সন্তু জিজ্ঞেস করল, "কী ব্যাপার, আমাকে কোথায় ধরে নিয়ে যাচ্ছ?"

লোক দুটো ইংরেজি বা হিন্দি কিছু বোঝে না। ওরা কী যে উত্তর দিতে লাগল, তারও এক অক্ষর সন্তুর বোধগম্য হল না।

খুব একটা লম্বা-চওড়া চেহারা নয় ওদের। সন্তু ক্যারাটে জানে। কিন্তু হাত দুটো পেছনে বেঁধে ফেললে খুব মুশকিল হয়। হাত দুটো সামনে বাঁধা থাকলেও তবু ব্যবহার করা যায়, অনেক কিছু আটকানো যেতে পারে। বাধা দেওয়ার আগেই ওরা হাত দুটো পিছমোড়া করে দিল!

টানেলের বাইরে জঙ্গল, তার মধ্য দিয়ে ওরা সন্তুকে হাঁটাচ্ছে। পরিষ্কার দিনের আলো, এখন বেলা সাড়ে বারোটা-একটা হবে। এর মধ্যে দিয়ে ওরা সন্তুকে হাত-বাঁধা অবস্থায় নিয়ে যাবে, কেউ দেখবে না? জঙ্গলের মধ্যে মানুষজন দেখা যাচ্ছে না অবশ্য, কিন্তু কোথাও কি থাকবে না মানুষ?

সন্তু ভাবল, জোজো এখন কী করবে? ও বেচারি তো কিছুই বুঝতে পারবে না। প্রথম মুখ চেপে ধরার সময় সন্তু একবার শুধু বুঁ-বুঁ শব্দ করতে পেরেছিল, ট্রেনের আওয়াজে জোজো তা শুনতে পায়নি বোধ হয়। জোজো মুখে যতই বড়-বড় কথা বলুক, একা হয়ে পড়লে খুব ঘাবড়ে যায়।

লোক দুটো মাঝে-মাঝে ধাক্কা দিচ্ছে সন্তুকে। এই করে তারা ডাইনে কিংবা বাঁয়ে বোঝাচ্ছে। পাহাড় থেকে নীচের দিকে নামছে ওরা। যদিও কোনও পথ নেই।

এক জায়গায় কাঠ কাটার শব্দ শোনা গেল। দেখতেও পাওয়া গেল দু'জন কাঠুরে একটা গাছ কাটছে। এই লোক দুটো লুকোবার চেষ্টা করল না, ওদের কাছ দিয়েই এগোচ্ছে। সন্তু চিৎকার করে উঠল, "হেল্প্, হেল্প্। বাঁচাও, বাঁচাও!"

কাঠুরে দুটো এদিকে ফিরল। ওদের হাতে কুড়ুল, তবু তারা সন্তুকে বাঁচাবার জন্য এক-পাও এগোল না, বরং এই লোক দুটোর একজন ওদের দিকে চেঁচিয়ে কী যেন বলল, অন্যজন প্রথমে সপাটে এক চড় কষাল সন্তুর গালে। তারপর আর একটা জোর ধাক্কা দিয়ে তাকে ফেলে দিল মাটিতে।

অর্থাৎ বোঝা গেল, এই লোকদুটো নিষ্ঠুর গুন্ডা হিসেবে এখানে পরিচিত, নিছক পরোপকার করার জন্য কেউ তাদের বাধা দেবে না।

সন্তু ভাবল, এবার নিশ্চয় ওরা তার চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলবে।

ঠিক তাই, একজন চুলের মুঠি ধরে টেনে তুলল, তারপর নিজের জামা তুলে

কোমরে গোঁজা রিভলভার দেখাল।

লক্ষ্মী ছেলের মতো মাথা নেড়ে সন্তু বলল, "বুঝেছি।" শুধু শুধু আর ওদের হাতে মার খেয়ে লাভ নেই। দৌড়ে পালাবার চেষ্টা করলে গুলি করবে। দেখাই যাক, কোথায় নিয়ে যায়।

পাহাড় থেকে খানিকটা নীচে নামার পর একটা পাকা রাস্তা দেখা গেল। ওরা দাঁড়িয়ে রইল একটা গাছের আড়ালে। এই রাস্তা দিয়ে মাঝে-মাঝে ট্রাক যাচ্ছে। দূর থেকে একটা ট্রাকের নম্বর দেখে ওদের মধ্যে একজন রাস্তার মাঝখানে গিয়ে থামাল সেটাকে। ড্রাইভার এদের চেনা। তার সঙ্গে কী যেন কথা হল। তারপর তিনজনেই উঠে পড়ল ট্রাকে। ড্রাইভারটি সন্তু সম্পর্কে কোনও কৌতূহল প্রকাশ করল না।

ট্রাকটা অবশ্য ওদের বেশিদূর নিয়ে গেল না, নামিয়ে দিল এক জায়গায়। সেখান থেকে আবার একটা ট্রাক ধরে খানিকদূর যাওয়ার পর নেমে পড়ে শুরু হল হাঁটা। এখানেও চতুর্দিকে পাহাড়, তবে জঙ্গল বিশেষ নেই।

সন্তু মনে-মনে ভাবল, এইসব পাহাড়ের মাঝখানেই কোথাও কি আরাকু উপত্যকা ? সেই জায়গাটা কেমন দেখতে, তা সন্তু জানে না, এদের কাছে কিছু জিজ্ঞেস করাও যাবে না।

প্রায় এক ঘণ্টা হাঁটার পর ওরা একটা গুহার মুখে পৌঁছল। সেখানে লোহার গেটে তালা ঝুলছে। ওদের মধ্যে একজন একটা পাথর নিয়ে গেটে ঠং ঠং করে একটুক্ষণ ঠোকার পর ভেতর থেকে একটা লোক এল। তার পিঠে বন্দুক ঝোলানো। সে তালা খুলে দিল।

গুহার ভেতরটা একেবারে অন্ধকার, কিছুই দেখা যায় না। ঢালু হয়ে নেমে যাচ্ছে নীচের দিকে। সন্তু দু-একবার হোঁচট খেয়ে পড়ল, হাত দিয়ে দেওয়াল ধরারও উপায় নেই। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর একটু-একটু আলো দেখা গেল। আলোটা কোথা থেকে আসছে, তা বোঝা যাচ্ছে না, কিংবা অন্ধকার চোখে সয়ে গেছে। গুহাটা ক্রমশ চওড়া হচ্ছে, সন্তু দেখল, দেওয়ালের গায়ে কীসব যেন মূর্তি রয়েছে। কয়েকটা মূর্তি ভেঙে পড়ে আছে মেঝেতে। কাকাবাবু এই মূর্তিগুলোর কথাই বলেছিলেন ? এরা তা হলে মূর্তি-চোর ?

একটা জায়গায় হ্যাজাক বাতি জ্বলছে, সেখানে আর একটি লোক বসে আছে দেওয়ালে হেলান দিয়ে। সেখানে ওরা থামল, একজন সন্তুর চুল ধরে জোর করে বসিয়ে দিল।

ওরাও বসল খানিকটা দূরে।

কিছুক্ষণ গল্প করার পর একজন খাবার নিয়ে এল। গোল হয়ে বসে ওরা খাবার খেতে লাগল। খাচ্ছে তো খাচ্ছেই, সন্তুর মনে হচ্ছে, অনন্তকাল ধরে চলছে ওদের খাওয়া।

সন্তুকে কিছু দেয়নি। সন্তু ভাবল, ওদের খাওয়া হয়ে গেলে নিশ্চয়ই

দেবে। কিন্তু ওদের শেষই যে হচ্ছে না! এতক্ষণ খাওয়ার কথা মনে পড়েনি। কিন্তু ওদের খেতে দেখে সন্তুর বেশ খিদে পেয়ে গেছে। অতিথিকে আগে খাবার দেওয়া উচিত ছিল না? বন্দিও তো এক হিসেবে অতিথি!

ওরা চেটেপুটে খেয়ে কোথায় যেন হাত ধুতে গেল। ফিরে এসে বিড়ি ধরিয়ে গল্প জুড়ে দিল আবার। সন্তুকে খাবার দেওয়ার কোনও নামই নেই।

আরও কিছুক্ষণ পরে সন্তু বুঝতে পারল, ওরা সত্যিই তাকে খাবার দেবে না। নিজেরা বসে-বসে খেল, একটু চক্ষুলজ্জাও নেই। একজন আবার নির্লজ্জের মতো মাঝে-মাঝে তাকাচ্ছে সন্তুর দিকে।

সন্তু ঠিক করল, খিদের কথা ভাববে না। ভাবলে বেশি কষ্ট হবে। মানুষ একদিন-দু'দিন না খেয়ে অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারে। বিপ্লবীরা দেশের জন্য কতদিন অনশন করেছেন। মহাত্মা গান্ধী প্রায়ই না খেয়ে থাকতেন। উঁহুঃ, এসবও খাওয়ার চিন্তা, অন্যদিকে মন ফেরাতে হবে।

জোজো এখন কী করছে? জোজো আরাকু ভ্যালিতে পৌঁছে গেছে বহুক্ষণ আগে। নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে সব খুলে বলেছে। এই জায়গাটা আরাকু ভ্যালি থেকে কতদূরে, তা সন্তু জানে না। কাকাবাবু ঠিক খুঁজে বার করবেন। কতক্ষণ লাগবে, সেই হচ্ছে কথা। ততক্ষণ না খেয়ে থাকতে হবে!

কপালটা চুলকোচ্ছে। কী একটা পোকা চলে গেল। হাত দুটো পেছন দিকে বাঁধা। চুলকোবার উপায় নেই। এ তো মহা মুশকিল! খাবার দিলে হাতের বাঁধন খুলতে হত, সেইজন্য দিল না?

চারটে লোককেই মনে হচ্ছে নিছক নিচু ধরনের গুন্ডা বা ডাকাত। লেখাপড়া জানে না। বুদ্ধিসুদ্ধি বিশেষ নেই। এখান থেকে মূর্তি ভেঙে-ভেঙে বিক্রি করে। এরা কাকাবাবুকে চিনবে কী করে? সন্তুকেই বা ধরে রাখবে কেন? এদের নেতা-টেতা কেউ নেই? এদের সঙ্গে যে কোনও কথাই বলা যাচ্ছে না!

যে দু'জন লোক সন্তুকে ধরে এনেছিল, তারা একটু পরে চলে গেল। অন্য দু'জন শুয়ে পড়ল পাশাপাশি। খাওয়া হয়েছে, এবার ঘুমোবে।

সন্তু আস্তে-আস্তে উঠে দাঁড়াল। গুহার মুখটার দিকে যেতে গেলে ওই লোক দুটোর পাশ দিয়ে যেতে হবে। আগেই সে-ঝুঁকি না নিয়ে সে পা টিপে-টিপে হেঁটে গেল গুহার আরও ভেতরের দিকে।

সেদিকে অন্ধকার বেশ পাতলা। ক্রমেই আলো বাড়ছে, ওপরের কোনও জায়গা দিয়ে দিনের আলো ঢুকছে। এদিককার দেওয়ালে কোনও মূর্তি নেই। সব খুলে নিয়েছে। সন্তু দেখল, এক জায়গায় চায়ের পেটির মতো বড়-বড় অনেক কাঠের বাক্স। ভেতরে কী আছে বোঝবার উপায় নেই, সন্তুর হাত বাঁধা। মূর্তিগুলোই ভরে রেখেছে মনে হয়!

আরও একটু এগোতে দেখা গেল এক জায়গায় জল জমে আছে। একটা

ছোটখাটো পুকুরের মতো। নিশ্চয়ই ওপরে কোথাও ফাটল আছে, সেখান থেকে বৃষ্টির জল আসে। ফাটল অবশ্য দেখা যাচ্ছে না। জল বেশ পরিষ্কার।

সেই জলাশয়টা পেরোবার পর এক জায়গায় গুহাটা শেষ হয়ে গেছে। এখানে আবার আলো কম। শেষের জায়গাটায় পরপর তিনটে খুপরির মতো। মানুষ তৈরি করেনি, দেখলেই বোঝা যায়, আপনাআপনি তৈরি হয়েছে। একটা খুপরির দেওয়ালে পোড়া-পোড়া দাগ। সেখানে সন্তু বারুদের গন্ধ পেল। এই দেওয়ালে অনেক মূর্তি ছিল ? বারুদের গন্ধ কেন ?

পাশের খুপরিটাও একই রকম। তৃতীয় খুপরিটার সামনের দিকটা একটা বড় পাথর ফেলে আড়াল করা। সেখানে উঁকি দিয়েই সন্তু ঘেন্নায় নাক কুঁচকে পিছিয়ে এল, বিচ্ছিরি বিকট গন্ধ। খুব সম্ভবত ওটা বাথরুম।

সন্তু আবার ফিরে এল। লোক দুটো কি ঘুমিয়ে পড়েছে ? গুহার মুখটার কাছে পৌঁছতে পারলে লোহার গেট পার হওয়ার একটা কিছু ব্যবস্থা করা যাবেই। কিন্তু কাছে আসতেই দেখল, ওদের মধ্যে একজন উঠে বসে বিড়ি খাচ্ছে। বন্দুকটা কোলের ওপর রাখা।

সন্তু কাছে এসে কাঁচুমাচু মুখ করে বলল, "ওয়াটার ? পানি ? বহুত পিয়াস লাগা।"

লোকটা বন্দুকটা তুলে সন্তুর দিকে তাক করে পাশের লোকটিকে ডাকল। সে লোকটি কাঁচা ঘুম ভাঙায় বিরক্ত হয়ে উঠে এল সন্তুর কাছে। এমন আচমকা ঘুসি মারল যে, সন্তুর মাথা ঠুকে গেল দেওয়ালে। তারপর সন্তু বসে পড়তেই সে একটা শক্ত নাইলনের দড়ি দিয়ে সন্তুর পা দুটোও বেঁধে ফেলল। সন্তু পা সরিয়ে নিতে পারছে না, কারণ অন্য লোকটির বন্দুকের নল তার বুকের দিকে।

এরা একেবারে যাচ্ছেতাই লোক। সন্তু চাইল জল, তা তো দিলই না, এখন পা দুটোর স্বাধীনতাও চলে গেল।

সন্তু সেখানেই পড়ে রইল একভাবে। লোক দুটি দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোল খানিকক্ষণ। সন্তুর চোখে ঘুম নেই। সে দেখতে লাগল বাইরের থেকে যে দিনের আলো আসছিল তা ফুরিয়ে গেল আস্তে-আস্তে।

সেই লোক দুটো সন্তুর দিকে আর মনোযোগ দিল না একবারও। ওদের এখানে পাহারা দেওয়া ছাড়া কাজ নেই। এক সময় ওরা চা তৈরি করে বিস্কুট ভিজিয়ে খেল। এরা তো মূর্তি ভাঙার কাজও করে না ? ভাল-ভাল মূর্তি সব ভাঙা হয়ে গেছে ! এরা শুধু বাক্সগুলো পাহারা দিচ্ছে ?

সন্ধের কিছু পরে আরও মানুষের গলার শব্দ পাওয়া গেল। একসঙ্গে ঢুকল দু'জন লোক। সাধারণ গুন্ডার মতো চেহারা এদের নয়। একজন সুট পরা। এদের মধ্যে একজন আবার মহিলা, সে পরে আছে জিন্স আর টি-শার্ট। মাথার চুল খোলা। সকলের হাতে টর্চ।

অন্যরা চলে গেল জলাশয়ের দিকে। শুধু মহিলাটি সন্তুর কাছে এসে উঁকি মারল। সন্তু তার চোখে চোখ রাখল। নিষ্ঠুর ধরনের দৃষ্টি সেই মহিলাটির। এর কাছ থেকে দয়া-মায়া পাওয়ার আশা নেই।

তবু সন্তু ইংরেজিতে জিজ্ঞেস করল, "ম্যাডাম, আমাকে ধরে রাখা হয়েছে কেন, জানতে পারি কি ?"

মহিলাটি কর্কশ গলায় বলল, "সময় হলেই জানতে পারবে।"

সন্তু আবার বলল, "কখন সেই সময় হবে ?"

মহিলাটি বলল, "তোমার আঙ্কলকে আগে এখানে আসতে হবে। সে এলেই তুমি ছাড়া পেয়ে যাবে।"

সন্তু বলল, "আমার আঙ্কল কি খবর পেয়েছেন ?"

মহিলাটি এবার ধমকে বলল, "শাট আপ !"

তারপর সে চলে গেল ভেতরের দিকে।

খানিক বাদে সন্তু দড়াম-দড়াম করে খুব জোর শব্দ শুনে চমকে উঠল। কেউ গুলি চালাচ্ছে ? আওয়াজ আসছে গুহার শেষ প্রান্ত থেকে। ওখানে কে গুলি চালাবে ? সন্তুর মনে পড়ল, দুটো কুঠরিতে সে পোড়া-পোড়া দাগ দেখেছিল। এরা এখানে গুলি চালানো প্র্যাক্‌টিস করে ?

সন্তু ব্যাপারটা ঠিক বুঝতে পারল না।

দশ-বারোবারের পর শব্দ থেমে গেল।

সবাই ফিরে এল হ্যাজাক বাতির কাছে। মেঝেতেই গোল হয়ে বসে কথা বলতে লাগল গম্ভীরভাবে। যেন কোনও গুরুতর বিষয় আলোচনা হচ্ছে। সন্তু কানখাড়া করে শোনার চেষ্টা করল। তার বিষয়েই কিছু বলছে ? ওরা কথা বলছে তেলুগু ভাষায়, সন্তুর বোঝার সাধ্য নেই। মাঝে-মাঝে দু-একটা ইংরেজি শব্দ। 'টেস্টিং', 'কোয়ালিটি', 'স্ট্যান্ডার্ড', 'টুমরো' এইরকম কয়েকটা শুধু শব্দ শুনেও কিছু বোঝা যায় না।

এক সময় সন্তু মাটিতে গড়াগড়ি দিতে-দিতে ওঃ ওঃ শব্দ করতে লাগল। বাচ্চারা অভিমান করে যেমন গড়াগড়ি দেয় সেইভাবে। সেইসঙ্গে কান্না। এবার ওরা সন্তুর দিকে মনোযোগ না দিয়ে পারল না।

মহিলাটি কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, "কী হয়েছে ? কুকুরের মতন চ্যাঁচাচ্ছ কেন ?"

সন্তু বলল, "বাথরুম, বাথরুম। সারাদিন আমাকে বাথরুমে যেতে দেওয়া হয়নি।"

মহিলাটি সুট-পরা পুরুষটির দিকে তাকাল। সে বলল, "বাঃ, বাথরুমে যাবে না ? এই জায়গাটা নোংরা করবে নাকি ? পাঠাবার ব্যবস্থা করো।"

একজন লোক এসে সন্তুর হাত আর পায়ের বাঁধন খুলে দিল। তার এক হাতে বন্দুক, অন্য হাতে বড় টর্চ। খানিকটা গিয়ে এক জায়গায় টর্চের আলো

ফেলে বলল, "ওইখান থেকে মগটা তুলে নাও। জল ভরো।"

গুহার শেষে এখনও তীব্র বারুদের গন্ধ ভাসছে, তাতে বাথরুমের দুর্গন্ধ অনেকটা চাপা পড়ে গেছে। সন্তুকে বাইরে জামা-প্যান্ট খুলতে হল। ভেতরে একটা গর্ত করা আছে, আর নিরেট পাথরের দেওয়াল। এদিক দিয়ে বেরোবার কোনও উপায় নেই।

সন্তুর সত্যিই খুব বাথরুম পেয়েছিল। মানুষ না খেয়ে তবু থাকতে পারে, কিন্তু বাথরুমে না গিয়ে কি পারে ? সন্তুর বেশ আরাম লাগল।

বেরিয়ে প্যান্ট-শার্ট পরার পর সন্তুকে আবার আনা হল আগের জায়গায়। সুট-পরা লোকটির দিকে তাকিয়ে সন্তু বলল, "আমাকে সারাদিন একফোঁটা জল খেতে দেয়নি। কোনও খাবারও দেয়নি। তোমরা কীরকম মানুষ ? পৃথিবীর সব দেশেই বন্দিদের খেতে দেওয়ার নিয়ম আছে।"

সেই লোকটি এক পলক সন্তুকে দেখেই মহিলাটির দিকে তাকিয়ে বিরক্তভাবে বলল, "মঞ্চি, একে কিছু খেতে দাওনি কেন ? এ ছোকরাটা অসুস্থ হয়ে পড়লে অনেক ঝঞ্ঝাট হবে। কাউকে বলো, আমার গাড়িতে কিছু কেক আছে, নিয়ে আসুক !"

সারাদিন কিছু খেতে না দিয়ে এখন একেবারে কেক ? এ যে রাজার মতো খাতির। সন্তু পেট ভরে কেক খেয়ে, দু' গেলাস জল শেষ করে বলল, "থ্যাঙ্ক ইউ !"

তারপর সে শুয়ে একটু পরেই ঘুমিয়ে পড়ল। আর তো কিছু করার নেই। এখন শরীর বেশ ঠাণ্ডা হয়েছে।

তার ঘুম ভাঙল বেশ বেলায়। সবাই চলে গেছে, শুধু রয়েছে দু'জন প্রহরী। তারা বসে-বসে চা খাচ্ছে।

সন্তু হ্যাংলার মতো তাকিয়ে রইল। ওদের মালিকরা নিশ্চয়ই নির্দেশ দিয়ে গেছে, আজ এক ভাঁড় চা আর দুটো বিস্কুট নিয়ে এল একজন।

সন্তু বলল, "হাত বাঁধা, খাব কী করে ?"

হাত খুলল না, লোকটা নিজেই খাইয়ে দিল সন্তুকে।

তৃপ্তি করে খেয়ে, সন্তু মিষ্টি হেসে বলল, "অনেক ধন্যবাদ, মেনি, মেনি থ্যাঙ্কস, বহুত শুক্রিয়া, আপনাদের ভাষায় কী যেন বলে তা আমি জানি না ভাই।"

অন্য লোকগুলো হয়তো আবার রাত্তিরে আসবে, সারাদিন এদের দু'জনের সঙ্গে কাটাতে হবে। এদের বোঝাতে হবে সে অতি শান্ত আর নিরীহ ছেলে। এবং ভিতু। না হলে মার খেতে হবে এদের হাতে। সুট-পরা লোকটার কথা শুনে বোঝা গেছে, সন্তুকে মেরে ফেলা হবে না, তাকে বাঁচিয়ে রাখাই উদ্দেশ্য। ওরা কাকাবাবুকে এখানে টেনে আনতে চায়।

খানিক পরে সন্তু বাথরুমে যেতে চাইল। একজন নিয়ে গেল তাকে। সন্তু

কোনওরকম চালাকি না করে বাধ্য ছেলের মতো ফিরে এল। আবার হাত-পায়ের বাঁধন মেনে নিয়ে বসে রইল।

খানিকক্ষণ পরে একটা বাসন উলটে পড়ার ঢনঢন শব্দে চমকে উঠল সন্তু। একটা বানর লাফাচ্ছে ভেতর দিকে। কোথাও কিছু রান্নাবান্নার জিনিসপত্র রাখা ছিল, তা নিয়ে টানাটানি করছে, প্রহরীরা রে-রে করে তেড়ে গেল। একটা নয়, তিনটে বানর, ওরা এল কোথা থেকে ? বানরগুলো হুপ-হুপ শব্দে লাফালাফি করে এক সময় পালাল। ওরা কোথা থেকে এল, কোথায় গেল, ঠিক বোঝা গেল না।

বানরগুলোর জন্য তবু কিছুক্ষণ মজা পাওয়া গেল। প্রহরীরা ইচ্ছে করলেই বানরদের গুলি করতে পারত, কিন্তু এরা বানর মারে না। ভক্তি করে।

বসে-বসে সময় কাটবে কী করে ? কতদিন এখানে থাকতে হবে ?

এক সময় প্রহরীরা রান্নার উদ্যোগ করতে লাগল। ওদের কাছে শুধু একটা স্টোভ আছে। আটা মেখে রুটি তৈরি করল, আর আলুর তরকারি। দূর থেকে সন্তু গুনছে, ক'টা রুটি সেঁকা হল। সবসুদ্ধু পনেরোটা। ওরা সন্তুকে দেবে নিশ্চয়ই। সন্তুর তিনখানা পেলেই চলবে !

দুপুরে খাওয়ার সময় সন্তুর পিছমোড়া বাঁধন খুলে দিয়ে হাত দুটো সামনে এনে বেঁধে দিল। তা হলে সন্তুকে খাইয়ে দিতে হবে না। ওই অবস্থায় সে নিজেই খেতে পারে। সন্তু ঠিক যা ভেবেছে, তাই। ওরা নিজেরা ছ'খানা করে রুটি নিয়ে সন্তুকে দিল তিনখানা। ওর আর লাগবে কি না, তা জিজ্ঞেসও করল না। ওরা নিজেরা হাত ধুয়ে এল, সন্তুকে জল দিল না।

ওরা যখন শুয়ে পড়ার উদ্যোগ করছে, তখন সন্তু বলল, "আর একবার বাথরুম যাব, প্লিজ !"

বাথরুম শব্দটা এরা এখন বুঝে গেছে। বন্দুকধারীটি শুয়ে রইল, আর-একজন রিভলভার নিয়ে চলল সন্তুর সঙ্গে-সঙ্গে। সন্তু গুনগুন করে একটা গান গাইছে।

বাথরুমে ঢুকেও সন্তু গান গাইতে লাগল। এবার তার বাথরুম পায়নি। তবু দুর্গন্ধের মধ্যে বসে রইল প্রায় দশ মিনিট। বাইরে থেকে লোকটা তাড়া দিয়ে কিছু বলছে। সন্তু তবু আরও খানিকটা দেরি করে বেরোল। লোকটা অধৈর্য হয়ে গেছে। প্যান্ট-শার্ট পরে নিয়ে সন্তু হাত দুটো বাড়িয়ে দিল বাঁধার জন্য।

লোকটি রিভলভারটা নামিয়ে রেখে দু' হাত দিয়ে সন্তুকে যেই বাঁধতে গেল, সন্তু লাথি কষাল তার থুতনিতে। সে ছিটকে পড়ে যেতেই সন্তু এক লাফে তার বুকের ওপর বসে মাথাটা কয়েকবার ঠুকে দিল পাথরে। লোকটার জ্ঞান চলে গেল। নিজের দড়ি দিয়ে সন্তু বেঁধে ফেলল ওর হাত আর পা।

এবার সন্তুর দু' হাত খোলা, তার হাতে অস্ত্র আছে। তাকে কে আটকাবে ? অন্য লোকটাকে পার হয়ে যেতে হবে গুহার মুখে।

অন্য লোকটা কী করে যেন টের পেয়ে গেছে। রাইফেল হাতে উঠে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে কী যেন বলল, তার সঙ্গীর সাড়া না পেয়ে সে গুলি চালাল সন্তুর দিকে। সন্তু ততক্ষণে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে পড়েছে, রাইফেলের টিপ করা অত সহজ নয় সে জানে, গুলিটা চলে গেল অনেক দূর দিয়ে।

লোকটা এবার দৌড়ে আসছে সন্তুর দিকে। অন্য কোনও উপায় নেই, সন্তু অন্ধকারে সরে গিয়ে লোকটির দিকে গুলি চালাল। পরপর দু'বার। লোকটি পড়ে গেল ধপাস করে। সন্তুর বুকটা ধকধক করতে লাগল। লোকটা মরে গেল নাকি ? সে মানুষ খুন করল ? সে না মারলে এই লোকটা নির্ঘাত তাকে মারত।

কাছে গিয়ে দেখল, দুটো গুলি লেগেছে লোকটার ডান কাঁধে। গলগল করে রক্ত বেরোচ্ছে। তবে ও বেঁচে যাবে। ওর হাত-পা বাঁধার দড়ি নেই, সন্তু তা নিয়ে মাথা-ঘামাল না, ওর এখনই জ্ঞান ফিরবে না। ওর পাশ থেকে টর্চটা তুলে নিল।

গুহার মুখের দিকে যাওয়ার আগে সন্তু উলটো দিকে গেল। একটা কৌতূহল তাকে মেটাতেই হবে। ওই বাক্সগুলোর মধ্যে কী আছে !

একটা বাক্সের ডালা খুলতেই দারুণ বিস্ময়ের চমক লাগল। মূর্তিটুর্তি কিছু নেই। থরে-থরে সাজানো রয়েছে হ্যান্ড গ্রেনেড। যুদ্ধের সময় ব্যবহার করা হয় যেসব হাতবোমা। এমনি কখনও এই বোমা দেখেনি সন্তু, অনেক যুদ্ধের ফিল্‌মে দেখেছে। লম্বা লম্বা আতার মতো।

এত বোমা এখানে কেন ? এইসব বোমা তৈরি করে মিলিটারি। এই লোকগুলো বোমা তৈরি করে বিক্রি করবে। কাল রাত্তিরে তা হলে গুলির শব্দ শোনেনি, এই বোমাগুলোর কয়েকটা পরীক্ষা করছিল। তাই টেস্টিং শব্দটা কয়েকবার বলছিল ওরা। এইরকম মাটির অনেক নীচে, গভীর গুহার মধ্যে বোমা তৈরি করলেও পরীক্ষা করে দেখা খুব নিরাপদ। কেউ টের পাবে না।

বাক্সগুলো দেখে মনে হল, এখানে কয়েক হাজার বোমা আছে।

আর দেরি করার উপায় নেই। বাক্সটা বন্ধ করে সন্তু সুড়ঙ্গের মুখের দিকে দৌড় শুরু করল। এদিকে একেবারে মিশমিশে অন্ধকার। টর্চ না থাকলে সন্তু একটুও এগোতে পারত না। বারকয় ধাক্কা খেতে হত। গুহাটা কোথাও বেশ সরু, কোথাও অনেক চওড়া। এই অন্ধকার জায়গাতেই দেওয়ালের গায়ে রয়েছে নানারকম মূর্তি।

গেটের তালার চাবি আনতে ভুলে গেছে সন্তু। কিন্তু গেটের ওপর দিকে খানিকটা খোলা। তরতর করে গেট বেয়ে উঠে সে অন্যদিকে লাফিয়ে পড়ল। মুক্তি, মুক্তি ! এরা সন্তুকে চেনে না, চিনলে আরও সাবধান হত।

রাত্তিরবেলা লোকগুলো কোথা থেকে এসেছিল, তারা কতদূরে থাকে, তা

জানে না সন্তু। হয়তো কাছাকাছি তাদের আস্তানা আছে। এখন লুকিয়ে পড়তে হবে। কোনও রাস্তাটাস্তা না খুঁজে সন্তু পাহাড়ের ওপরদিকে উঠে গেল। বড়-বড় পাথরের আড়ালে গা-ঢাকা দেওয়া সোজা, কেউ দেখতে পাবে না।

মাঝে-মাঝে কিছু ঝোপঝাড় ছাড়া এ-পাহাড়ে বড় গাছ বিশেষ নেই। তবে চারদিকে যেরকম ঢেউয়ের মতো পাহাড়ের পর পাহাড়, এর মধ্যে থেকে কোনও লোককে খুঁজে বের করা চাট্টিখানি কথা নয়!

সন্তু কাঠবিড়ালির মতো তরতর করে উঠে যেতে লাগল এক পাথর থেকে অন্য পাথরে। তারপর একটা ছায়াঘেরা জায়গা দেখে বিশ্রাম করতে লাগল।

ওই লোকগুলো তাকে ধরে রেখেছিল কেন, সন্তু চিন্তা করতে লাগল। এরা মূর্তি-চোর নয়, বোমার চোরাকারবারি। মানুষ খুনের ব্যবসা। দেশের কত জায়গায় দাঙ্গা-হাঙ্গামা, লড়াই হয়, সেইসব জায়গায় এরা বোমা বিক্রি করে। হয়তো দু' পক্ষের কাছেই। সীমান্ত অঞ্চলে কত বিদ্রোহী, উগ্রপন্থী দল আছে, এইসব বোমা চলে যাবে তাদের হাতে। তারা যে এ-দেশের কত ক্ষতি করছে, তা নিয়ে এই ব্যবসায়ীরা মাথা ঘামায় না। হাজার-হাজার মানুষ মরুক, এরা নিজেদের টাকা পেলেই খুশি।

কিন্তু এদের সঙ্গে কাকাবাবুর সম্পর্ক কী? কাকাবাবুর মুখে বোমাটোমার কথা তো কিছু শোনেনি সন্তু। কাকাবাবু কতকগুলো নতুন আবিষ্কার করা মূর্তি দেখতে এসেছিলেন। সেগুলো কি এই গুহার দেওয়ালের গায়ের মূর্তি? কাকাবাবু এই গুহায় আসতে চেয়েছিলেন। ইতিমধ্যে এরা এই গুহাটা দখল করে নিয়ে এখানে বোমা তৈরি করছে। কাকাবাবু সেটা জেনে ফেললে ওদের মহা বিপদ। হুঁ, ব্যাপারটা আসলে তাই। কিন্তু কাকাবাবুর তো এর মধ্যেই এই গুহায় চলে আসা উচিত ছিল, উনি এখনও পৌঁছলেন না কেন? ভাইজাগ থেকে চলে এসেছেন তিনদিন আগে...তা হলে কি উনি এদের কথা টের পেয়ে গেছেন? তৈরি হয়ে নিচ্ছেন?

কাল দুপুরে যে দুটো লোক সন্তুকে ধরে এনেছিল, তারা কি আজও আসবে? এলেই সন্তুর পালানোর ব্যাপারটা জেনে যাবে। নিশ্চয়ই মালিকদের ভয়ে তারা মরিয়া হয়ে খুঁজবে সন্তুকে। সন্তুর পক্ষে এক্ষুনি পাহাড় ছেড়ে রাস্তায় নামা ঠিক হবে না। সে শুয়েই রইল।

আরও একটা কথা মনে হল সন্তুর। এই গুহার মধ্যে বোমার স্টকের কথা সন্তু জেনে ফেলেছে। সন্তু যদি আবার ধরা না পড়ে, তা হলে ওরা নিশ্চয়ই এতসব বোমা এখান থেকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। আবার কোনও জায়গায় লুকোবে। কিংবা বিক্রি করে দেবে! হাজার-হাজার বোমা, কত মানুষ মরবে, কত বাড়ি ধ্বংস হবে। এইসব জিনিসের ব্যবসা যারা করে, তারা তো আসলে নরপশু!

সন্তুর হাত নিশপিশ করছে। ইস, কেন সে বোমাগুলো নষ্ট করে দিয়ে এল না! কোনওরকমে জায়গাটায় আগুন ধরিয়ে দিলে হত। কিন্তু সন্তু পালাবার চিন্তায় ব্যস্ত ছিল। খালি মনে হচ্ছিল, আরও যদি কেউ এসে পড়ে!

বিকেল ফিকে হয়ে এল ক্রমশ। সন্তু শুয়ে-শুয়ে নিজের সঙ্গে তর্ক করে যাচ্ছে। তার মনের মধ্যে দুটো ভাগ হয়ে গেছে। এক ভাগ বলছে, "ছিঃ সন্তু, তুমি অত মানুষ মারার অস্ত্র দেখেও কিছু না করে চলে যাবে?"

অন্য ভাগ বলছে, "আমি কী করব? তখন পালানোটাই ছিল বড় কথা। মানুষ আগে নিজে বাঁচতে চায়।"

"স্বার্থপরের মতন কথা বোলো না। কত লোক এই বোমার আঘাতে মরবে, তার তুলনায় তোমার নিজের জীবনটা বড় হল? ইচ্ছে করলে তুমি এখনও সেই লোকদের বাঁচাতে পারো।"

"কী করে?"

"ওই গুহার মধ্যে আবার ফিরে যাও!"

"আবার? সাধ করে কেউ আর ওখানে মাথা গলায়? ধরা পড়লে এবার নির্ঘাত খুন হয়ে যাব।"

"ধরা পড়বে কেন?"

"বারবার কি একই রকম ভাবে বাঁচা যায়?"

"ভয় পাচ্ছ সন্তু? তুমি রাজা রায়চৌধুরীর ভাইপো সুনন্দ রায়চৌধুরী। তোমার এরকম ভয় পাওয়াটা মানায় না।"

"ভয়ের কথা হচ্ছে না। শুধু-শুধু গোঁয়ার্তুমি করার কী মানে হয়? আবার ফিরতে হলে, ওই সুড়ঙ্গের মুখ দিয়ে, ভেতরে অত অন্ধকার, টর্চ না জ্বেলে উপায় নেই। ভেতরে কেউ থাকলে সেই টর্চের আলো দেখে খুব সহজে আমাকে গুলি করতে পারবে।"

"হয়তো অন্য কোনও পথ আছে। বানরগুলো ঢুকেছিল কী করে? তারা কোনদিক দিয়ে পালাল? সেই পথটা খুঁজে দেখো।"

"বানরটানরের কথা ছাড়ো তো! আবার ফিরে যাওয়ার গোঁয়ার্তুমিটা কাকাবাবু সমর্থন করতেন?"

"কাকাবাবু তোমার জায়গায় থাকলে ঠিক আবার ফিরে যেতেন। কাকাবাবু তো এইরকমই গোঁয়ার! জেদি!"

"ভেতরে যদি অনেক লোক এসে থাকে, আমি একা কী করে লড়ব?"

"অনেক সময় একাই দাঁড়াতে হয় সন্তু। যতই লোক থাকুক বিপক্ষে, তবু সত্যের জন্য একা দাঁড়াতে হয়। ইবসনের 'অ্যান এনিমি অব দ্য পিপ্‌ল' নাটকটা তুমি কিছুদিন আগেই তো পড়েছ, মনে নেই? যে-নাটকের শেষে আছে, যে একলা দাঁড়াতে পারে, সে-ই সবচেয়ে শক্তিশালী। দ্য স্ট্রংগেস্ট ম্যান ইজ হি, হু স্ট্যান্ডস অ্যালোন।"

সন্তু ধড়মড় করে উঠে বসল, সত্যি তো, বানরগুলো ঢুকেছিল কোথা দিয়ে ? তারা গুহার মুখের দিকেও ছুটে পালায়নি। তা হলে সত্যি আর একটা রাস্তা আছে ঢোকার। একটা বানর বেশ বড় ছিল।

সন্তুর মনের দুটো ভাগ একসঙ্গে মিলে গেছে। সে ঠিক করে ফেলেছে, সে এখন এখান থেকে যাবে না। আজ রাতের মধ্যেই যদি ওরা বোমার বাক্সগুলো সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, সন্তু ওদের অনুসরণ করবে। ওগুলো কোথায় নিয়ে যায়, তা দেখতে হবে। আর যদি বোমাগুলো না সরায় আজ, তা হলে কাল সকালে সে আবার ওই গুহায় ফিরে যাবে। বানরদের ঢোকার পথটা খুঁজে বার করতে হবে।

পাহাড় থেকে খানিকটা নেমে এল সন্তু। যাতে গুহার প্রবেশপথটায় নজর রাখা যায়। জেগেই বসে রইল ঘণ্টার পর ঘণ্টা। মাঝে-মাঝে ঝিমুনি আসছে, আবার উঠে বসছে। ভাগ্যিস দুপুরে তিনটে রুটি খেয়েছে, তাই তেমন খিদে পাচ্ছে না।

রাতে কেউ এল না। সেই পাঁচ-ছ'জন এলে নিশ্চয় কোনও গাড়ির শব্দ পাওয়া যেত, তারা তো হেঁটে আসবে না। ভোরের দিকে ঘুমিয়ে পড়ল সন্তু।

চোখে রোদ লাগায় তার ঘুম ভাঙল।

একটু এগিয়ে এসে দেখল, গুহার মুখের লোহার গেটটা খোলা। দু'জন লোক একটা রবারের চাকা লাগানো ছোট ঠেলা গাড়ি সেই গুহার মধ্যে ঢোকাবার চেষ্টা করছে। সন্তু চমকে উঠল। ওই ঠেলাগাড়িতে করেই বাক্সগুলো বার করবে। এর আগেও কিছু বার করে ফেলেছে নাকি ?

আর সময় নেই। ঠেলাগাড়িটাকে শেষপর্যন্ত নিয়ে যেতে বেশ কিছুক্ষণ লাগবে, কারণ গুহার অনেক বাঁক, কোথাও বেশ উঁচু-নিচু। ওটা পৌঁছবার আগেই সন্তুকে বানরদের ঢোকার পথ খুঁজে বার করতে হবে।

সন্তু গুহার ছাদের ওপর দিয়ে দৌড়ল।

এক জায়গায় একটা বেশ বড় ঝুপসি বটগাছ, তাতে দোল খাচ্ছে অনেক বানর। এইখানেই তা হলে পাওয়া যেতে পারে।

প্রথমে সন্তু গর্ত-টর্ত কিছু দেখতে পেল না। তবে এক জায়গায় দেখল পাথরের দুটো ভাঁজ। মাঝখানটায় ফাঁক। ইচ্ছে করলে কোনও মানুষ শুয়ে পড়ে গড়িয়ে-গড়িয়ে সেই ভাঁজের মধ্যে ঢুকে পড়তে পারে। সন্তু আগে একবার পা গলিয়ে দেখে নিল।

কয়েকটা বানর কাছাকাছি এসে খ্যাঁক-খ্যাঁক করছে। তাদের নিজস্ব যাতায়াতের পথটা অন্য কাউকে ব্যবহার করতে দিতে চায় না। রিভলভারটা কোমরে গুঁজে, এক হাতে টর্চ নিয়ে চিত হয়ে শুয়ে সেই ভাঁজের মধ্যে ঢুকে পড়ল সন্তু।

বেশ খানিকটা যেতে হল। এইখান দিয়ে জল চুঁইয়ে পড়ে, শ্যাওলা জমে

আছে, এখনও ভিজে-ভিজে। হঠাৎ পাথর শেষ হয়ে গেল, তারপরেই গুহা।

সন্তু প্রথমে খুব সন্তর্পণে মাথাটা বার করে দেখল। তলাতেই সেই জলভর্তি জায়গাটা। ভালই হল, প্রহরীরা খানিকটা দূরে বসে। কিন্তু এখান থেকে গুহার মেঝে অনেক নিচু, নামা যাবে কী করে ? ঝাঁপ দিলে একেবারে জলাশয়ে পড়তে হবে। বানরগুলো নিশ্চয়ই সেইভাবে নামে না।

এদিক-ওদিক হাত বুলিয়ে সন্তু পেয়ে গেল গাছের মোটা শিকড়। ওপরেই একটা বটগাছ রয়েছে। বটের শিকড় অনেক দূর পর্যন্ত যায়। সেই শিকড় ধরে যা থাকে কপালে ভেবে ঝুলে পড়ল সন্তু।

শিকড়গুলো ঝুলছে, একেবারে শেষপর্যন্ত পৌঁছয়নি। শেষের দিকে সন্তুকে একটা ছোট্ট লাফ দিয়ে নীচে নামতে হল। সঙ্গে-সঙ্গে দেওয়ালে সেঁটে দাঁড়িয়ে রইল কয়েক মিনিট।

কাল যেখানে সন্তু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় শুয়ে ছিল, সেখানে বসে আছে দুটো লোক। এদিকে পিঠ ফেরানো। ঠেলাগাড়িটার জন্য অপেক্ষা করছে। যে লোক দুটো গাড়িটা ঠেলে আনছে, তাদের গলার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ওরা এসে পড়লে চারজন হবে।

সন্তু নিঃশব্দে ছুটে গেল কাঠের বাক্সগুলোর দিকে। একটা হ্যান্ড গ্রেনেড তুলে দেখল। সিনেমায় সে দেখেছে, সৈন্যরা মুখ দিয়ে কী যেন একটা খুলে তারপর ছুড়ে মারে। সন্তু এগুলোতে খোলার কিছু দেখল না। এগুলো বোধ হয় উন্নত ধরনের।

বাঁ হাতে রিভলভারটা নিয়ে ডান হাতে সন্তু সেই বোমাটা ছুড়ে মারল খুব জোরে। লোক দুটোর গায়ে নয়, পাশের দেওয়ালে।

বিরাট শব্দে সেটা ফাটল, খসে পড়ল পাথরের চাপড়া, দেখা গেল আগুনের ঝলকানি। বোমাটা যে এতখানি শক্তিশালী, তা সন্তু আন্দাজ করতে পারেনি।

লোক দুটো আর্তনাদ করে শুয়ে পড়েছিল, আবার উঠে দাঁড়াতেই সন্তু আর একটা বোমা ছুড়ল ওদের পায়ের কাছে। ওরা আর রাইফেল তুলে নেওয়ার সময় পেল না, সুড়ঙ্গের মুখের দিকে দৌড় দিল।

সন্তু তাড়া করে গিয়ে আরও দুটো বোমা পরপর ছুড়ে দিল ওদের দিকে। বোমা ফাটার শব্দ ছাড়াও হুড়মুড় করে আর একটা শব্দ হল। ওরা অন্ধকারে গিয়ে পড়েছে সেই ঠেলা গাড়িটার ওপর। আঁ-আঁ করে একটা কাতর চিৎকারও শোনা গেল, একজন বোধ হয় পড়ে গেল খাদে।

ওদের দিকে আরও একটা বোমা ছুড়ে সন্তু ফিরে এল বাক্সগুলোর কাছে। সাত-আটটা বোমা প্যান্টের দু' পকেটে আর জামার মধ্যে ভরে সন্তু বটগাছের শেকড় ধরে সরসর করে উঠে এল ওপরে। সেই পাথরের ভাঁজের আড়ালে গিয়ে সে একটা একটা করে বোমা ছুড়ে মারতে লাগল কাঠের বাক্সগুলোর দিকে। প্রথম দুটো ফসকে গেল। তৃতীয়টা ছুড়ল মাথা ঠাণ্ডা করে। এবারে

ঠিক লাগল, প্রচণ্ড বিস্ফোরণে গুহাটা কেঁপে উঠল। বাক্সটায় আগুন ধরে গিয়ে বাজির মতন অন্য বোমাগুলো ফাটছে। হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে পাথর।

আরও কয়েকটা বোমা ছুড়ে সন্তু উঠে পড়ল। তার কাজ শেষ হয়ে গেছে। এই বোমায় আর মানুষ মরবে না। এই বোমাগুলো আর কেউ উদ্ধার করতে পারবে না।

এর পরের দৃশ্যটি ভারী সুন্দর। দু' গাড়ি পুলিশ এসে গেছে সেই মুহূর্তে। কাকাবাবু, নরেন্দ্র ভার্মা আর রাজমহেন্দ্রী হেঁটে আসছেন আগে-আগে। গুহা থেকে ছুটতে-ছুটতে বেরোল তিনজন, সঙ্গে-সঙ্গে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে গেল। গুহার মধ্যে তখনও বিস্ফোরণ চলেছে। কাকাবাবুরা থমকে দাঁড়ালেন।

জোজোই প্রথম দেখতে পেয়ে বলল, "ওই তো সন্তু।"

গুহার ছাদের ওপর সন্তু হাসিমুখে দাঁড়িয়ে আছে। কাকাবাবুকে দেখেই তার মনে হয়েছে, সব পরিশ্রম সার্থক!

লাফিয়ে-লাফিয়ে সে নীচে নেমে এসে কাকাবাবুকে জড়িয়ে ধরল।

কাকাবাবু জিজ্ঞেস করলেন, "গুহার ভেতরে কী হচ্ছে রে সন্তু?"

সন্তু বলল, "বোমা ফাটছে। এই যে, এই বোমা।"

তার পকেটে এখনও একটা আছে, সে বার করে দেখাল।

নরেন্দ্র ভার্মা আর কাকাবাবু চোখাচোখি করলেন। কাকাবাবু বললেন, "কাল রাত্তিরে আমার মনে হয়েছে, এই গুহার মধ্যে ওরা বোমার কারবার করছে। সেইজন্যেই আমাকে আর ভার্গবকে আসতে দিতে চায়নি।"

সন্তু বলল, "কাকাবাবু, আর দু'-একদিন পরে এলে কিছুই দেখতে পেতেন না। ওদের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছিল। আজই সব বোমা পাচার করে দিত। ওদের ব্যাড লাক যে, আপনি এর মধ্যেই মূর্তি দেখার জন্য এসে পড়লেন।"

নরেন্দ্র ভার্মা জিজ্ঞেস করলেন, "কত বোমা ছিল এর মধ্যে?"

সন্তু বলল, "গুনিনি। কয়েক হাজার তো হবেই। তবে আমি সব শেষ করে দিয়েছি।"

নরেন্দ্র ভার্মা শিস দিয়ে উঠলেন। তারপর সন্তুর কাঁধ চাপড়ে বললেন, "ব্রাভো। ওয়েল ডান, সন্তু! তুমি একাই তো কেল্লা ফতে করে দিলে।"

কাকাবাবু সস্নেহে বললেন, "আজকাল ও একাই অনেক কিছু পারে। আমার সাহায্যের দরকার হয় না। তোর লাগেনি তো কোথাও? ডান হাতে কী হয়েছে, রক্ত পড়ছে?"

কোনও এক সময় পাথরে ঘষে গিয়ে ডান কাঁধের কাছটা খুবলে গেছে। রক্ত বেরোচ্ছে সেখান থেকে। সন্তু এতক্ষণ খেয়ালই করেনি। সে বলল, "ও কিছু না।"

জোজো সন্তুকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে ফিসফিস করে বলল, "কাকাবাবু

হারিয়ে গিয়েছিলেন, আমিই তাঁকে খুঁজে বার করেছি, বুঝলি। কাল রাত্তিরে আমি কাকাবাবুকে বললুম, মূর্তি-চুরিটুরির কথা এখন থাক। আগে সন্তুকে উদ্ধার করতে হবে। আমি ঠিক জানতুম, তোকে একটা গুহার মধ্যে আটকে রেখেছে। আমার কথাতেই তো পুলিশ নিয়ে এখানে আসা হল।"

সন্তু জোজোর কাঁধে হাত রেখে বলল, "তাই নাকি ? ভাগ্যিস তোরা এসে পড়েছিস, না হলে আমার খুব বিপদ হত ! তুই ঠিক বুদ্ধি দিয়েছিস জোজো। আমি জানতুম, তুই যখন আছিস, আমি উদ্ধার পাবই। তুই-ই তো এবারের হিরো।"

জোজো বলল, "রাধা গোমেজ নামে একটা মেয়েকে আমরা ধরে রেখেছিলাম, আমিই বুদ্ধি দিয়েছিলাম কাকাবাবুকে বুঝলি ? এই রাধার বাবাই হচ্ছে চোরা চালান চক্রের সর্দার। কাল শেষ রাতে আমাদের হোটেল খুঁজে ওই গোমেজ সর্দার দলবল নিয়ে এসে আক্রমণ করে। আগেই পুলিশের ফাঁদ পেতে রাখা হয়েছিল, সবাই ধরা পড়ে গেছে। গোমেজ এমন হিংস্র যে ওই অবস্থাতেও আমাকে প্রায় খুন করে ফেলেছিল আর কি ! নরেন্দ্র ভার্মা ঠিক সময় আটকে দিলেন, তিনি এক গুলিতে গোমেজের মাথার খুলি উড়িয়ে দিচ্ছিলেন, কাকাবাবু বাধা দিয়ে বললেন, যাক, যাক। ওকে প্রাণে মারতে হবে না। আমি রাধাকে কথা দিয়েছি। আমি অবশ্য এক ঘুসিতে পাঁচখানা দাঁত ভেঙে দিয়েছি ওর।"

কাকাবাবু গুহার মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, মুখ ফিরিয়ে বললেন, "জোজো, গুনে দেখেছিলে, ঠিক পাঁচটা ?"

জোজো বলল, "অন্তত চারটে তো হবেই।"

কাকাবাবু বললেন, "ওপরের দাঁত না নীচের দাঁত ?"

জোজো বলল, "ওপরের দুটো আর নীচের একটা তো আমি মাটিতে পড়ে থাকতেই দেখেছি !"

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার ঘুসিটা ফসকে গিয়ে আমার গায়ে লেগেছিল। আমার কিন্তু একটা দাঁতও ভাঙেনি।"